NAHWA EDITIONS · NE-005 · ১১ অধ্যায়

হার্ট ডিজিজ | অন্তরের রোগ

নিজের অন্তর, নিয়ত ও আচরণ নিয়ে দশটি আলোচনা এবং একটি সমাপনী আত্মপর্যালোচনা।

পাঠ সংস্করণ R1 · স্বাধীন পর্যালোচনা চলমান

সংরক্ষিত সম্পাদিত v0.2 মূলপাঠ থেকে বইয়ের মতো অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠাবিন্যাসে সাজানো হয়েছে। মূল আলোচনা, আরবি পাঠ, সূত্র এবং সম্পাদকীয় সতর্কতা রাখা হয়েছে। এটি স্বতন্ত্র আলেম, ইতিহাসবিশেষজ্ঞ বা স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞের চূড়ান্ত অনুমোদনের দাবি নয়। প্রয়োজনীয় সতর্কতা সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের সঙ্গে পড়ুন। PDF থেকে বাংলা কপি করার ফল viewer অনুযায়ী বদলাতে পারে।

সূচিপত্র ১১টি অধ্যায়

১ রিয়া | লোক দেখানো

২ উজব | নিজের ভালোত্বে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাওয়া

৩ কিবর | অহংকার

৪ অন্যের ভালো দেখে বুক জ্বলে? সাবধান, এটা হিংসা হতে পারে

৫ কুধারণা | প্রমাণ ছাড়াই মানুষের ব্যাপারে খারাপ ভাবা

৬ হুব্বুল মাদহ | প্রশংসার নেশা

৭ শামাতাহ | অন্যের পতনে গোপন আনন্দ

৮ হুব্বুদ দুনিয়া | দুনিয়ার মোহ

৯ গাফলাহ | আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীনতা

১০ কাসওয়াতুল ক্বলব | হৃদয়ের কঠোরতা

১১ সমাপনী | আমার অন্তর কি সত্যিই সুস্থ?

সূত্রতালিকা

অধ্যায় ০১

রিয়া | লোক দেখানো

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

সূত্র ও সম্পাদকীয় নোট

সম্পাদকীয় সূত্র নোট: ছোট শিরককে রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা বর্ণনার ঠিকানা মুসনাদ আহমাদ ২৩৬৩০। HadeethEnc এটি হাসান হিসেবে উপস্থাপন করেছে। মূল লেখায় অনুপস্থিত সূত্রের পরিচয় এখানে যোগ করা হলো।

দু'আর পাঠসংশোধন: নিচের আরবি পাঠটি আল আদাবুল মুফরাদ ৭১৬ এর শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগের পাঠের কিছু শব্দ এই সূত্রে হুবহু নেই। Sunnah.com-এ আলবানীর মূল্যায়ন সহিহ হিসেবে দেওয়া আছে; এটি সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নের পরিচয়, সব সনদের অভিন্ন সিদ্ধান্তের দাবি নয়।

আল আদাবুল মুফরাদ ৭১৬

প্রয়োগের সীমা: ভালো কাজের পরে মানুষের প্রশংসা পাওয়া বা তাতে আনন্দ হওয়াই রিয়ার প্রমাণ নয়। সহিহ মুসলিম ২৬৪২a-তে এমন প্রশংসাকে মুমিনের আগাম সুসংবাদ বলা হয়েছে। মানুষের প্রশংসা অর্জনের নিয়তে কাজ করা এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রশংসা পাওয়া এক নয়।

সহিহ মুসলিম ২৬৪২a

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজ থেকে আমরা শুরু করছি একটি নতুন ধারাবাহিক সিরিজ, “হার্ট ডিজিজ | অন্তরের রোগ সিরিজ”। এই সিরিজে ইন শা আল্লাহ আমরা একে একে আলোচনা করব সেইসব গোপন অন্তরের রোগ নিয়ে, যেগুলো বাইরে থেকে সবসময় বোঝা যায় না, কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের ইখলাস, আমল, আখলাক ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে দুর্বল করে দেয়। অনেক সময় মানুষ বাইরে থেকে ভালো দেখায়, কিন্তু অন্তরের ভেতরে এমন কিছু রোগ বাসা বাঁধে, যা তার আমলকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়। এই সিরিজের উদ্দেশ্য কাউকে ছোট করা নয়; বরং নিজেকে চিনতে শেখা, অন্তরের রোগ শনাক্ত করা, এবং আল্লাহর সাহায্যে ধীরে ধীরে চিকিৎসার পথে হাঁটা।

আজকের পর্বের বিষয়, রিয়া। রিয়া মানে হলো, এমনভাবে ভালো কাজ করা, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টির পাশাপাশি বা তার বদলে মানুষের দেখা, প্রশংসা, স্বীকৃতি বা সম্মান পাওয়ার চাওয়াও ঢুকে যায়। বাহ্যিকভাবে কাজটি ভালোই হতে পারে, নামাজ, তিলাওয়াত, দান, দ্বীনি পোস্ট, ক্লাস নেওয়া, নসিহাহ করা, কিন্তু অন্তরের ভেতরে যদি মানুষকে দেখানোর প্রবণতা থাকে, তাহলে সেটাই রিয়া।

এই রোগের ভয়াবহতা এখানেই, এটা সবসময় বড় বড় কাজের মধ্যে আসে না। খুব সূক্ষ্মভাবে ঢুকে যায়। আপনি হয়তো একা থাকলে ছোট করে নামাজ পড়তেন, কিন্তু কেউ দেখছে দেখে নামাজকে আরও সুন্দর করে ফেললেন। আপনি হয়তো এমন কিছু সদকা করলেন, যা কেউ না জানলেও হতো; কিন্তু মনে মনে চাইছিলেন, মানুষ জানুক। আপনি হয়তো দ্বীনের কথা বলছেন, কিন্তু অন্তরে একটা অংশ চাইছে, “মানুষ আমাকে দ্বীনদার ভাবুক”। এই সূক্ষ্ম জায়গাগুলোই খুব ভয়ংকর। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ

الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ

“অতএব দুর্ভোগ সেই সব নামাজিদের জন্য, যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে উদাসীন, যারা লোক দেখানো করে।” সূরা আল মাউন: ৪ থেকে ৬ লক্ষ্য করুন, আয়াতে নামাজ ছাড়ার কথা বলা হয়নি; বরং নামাজ আদায় করেও এমন লোকদের কথা বলা হয়েছে, যাদের আমলের ভেতরে রিয়া ঢুকে গেছে। অর্থাৎ শুধু বাহ্যিক আমল থাকলেই নিরাপত্তা নেই; অন্তরের অবস্থা ঠিক আছে কি না, সেটাও জরুরি।

এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতের জন্য যেটিকে খুব ভয় করতেন, সেটি হলো “ছোট শিরক”, আর সেটি হলো রিয়া, অর্থাৎ লোক দেখানো। কারণ এতে মানুষ আল্লাহর জন্য করা ইবাদতের মধ্যে মানুষের অংশ ঢুকিয়ে ফেলে। এ জন্য রিয়া শুধু একটি নৈতিক দুর্বলতা নয়; এটি ইখলাসের উপর এক ধরনের গভীর আঘাত।

এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কীভাবে বুঝব, আমাদের ভেতরে রিয়ার সমস্যা আছে কি না?

কিছু লক্ষণ আছে। যেমন, মানুষ দেখলে আমলে আগ্রহ বেড়ে যায়, কিন্তু একা থাকলে ঢিলে হয়ে যায়। প্রশংসা পেলে খুব আনন্দ হয়, কিন্তু কেউ গুরুত্ব না দিলে কষ্ট হয়। ভালো কাজ করার পরে মনে হয়, "মানুষ জানলে ভালো হতো।" মানুষের সামনে কাঁদা সহজ, কিন্তু একা সিজদায় কান্না আসে না। গোপনে করা আমলের চেয়ে public আমলে বেশি স্বস্তি লাগে। দ্বীনি কাজের পর মনে হয়, "মানুষ কি আমাকে noticed করল?"

এসব অনুভূতি যদি কখনো অন্তরে আসে, তাহলে ভয় পাওয়ার মতো বিষয় আছে। তবে হতাশ হওয়ার নয়। কারণ অন্তরের রোগ চিনতে পারাও চিকিৎসার শুরু। রিয়ার সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো, এটি মানুষকে ধীরে ধীরে আল্লাহকেন্দ্রিক জীবন থেকে মানুষকেন্দ্রিক জীবনে নিয়ে যায়। তখন ইবাদতের কেন্দ্র আর আল্লাহ থাকেন না; বরং মানুষের দৃষ্টি, প্রশংসা, likes, comments, image, reputation, এসব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মানুষ তখন আল্লাহর সন্তুষ্টির চেয়ে মানুষের approval নিয়ে বেশি ভাবে। বাহ্যিকভাবে সে আমল করছে, কিন্তু অন্তরের দিকনির্দেশনা বদলে যাচ্ছে।

তাহলে চিকিৎসা কী?

প্রথমত, নিজের নিয়ত বারবার renew করতে হবে। কোনো ভালো কাজের আগে, মধ্যে, পরে, নিজেকে মনে করিয়ে দিতে হবে: "আমি এটা কার জন্য করছি?" যদি দেখেন অন্তরে মানুষ ঢুকে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনুন।

দ্বিতীয়ত, গোপন আমল বাড়াতে হবে। এমন কিছু নামাজ, এমন কিছু দোয়া, এমন কিছু সদকা, এমন কিছু কান্না, যা শুধু আপনি আর আল্লাহ জানেন। কারণ গোপন আমল ইখলাসের জন্য খুব শক্তিশালী ওষুধ। তৃতীয়ত, প্রশংসার নেশা থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। মানুষ আজ প্রশংসা করবে, কাল ভুলে যাবে। কেউ আপনাকে সম্মান দিলেও, তাতে আখিরাত নিশ্চিত হয় না। কিন্তু আল্লাহ যদি একটি আমল কবুল করেন, সেটিই আপনার জন্য যথেষ্ট।

চতুর্থত, আমলের চেয়ে কবুলিয়াত নিয়ে বেশি চিন্তা করতে হবে। আমরা অনেক সময় ভাবি, আমি কত করলাম। অথচ মুমিনের আরেকটি ভয় থাকে, আল্লাহ কি কবুল করলেন? এই ভয় মানুষকে নম্র রাখে। পঞ্চমত, আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। এমন একটি দোয়া আছে, যা অন্তরের এই সূক্ষ্ম রোগ থেকে বাঁচার জন্য খুব উপকারী:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

অর্থ: “হে আল্লাহ! আমি জেনে শুনে আপনার সাথে কাউকে শরিক করা থেকে আপনার আশ্রয় চাই, আর না জানা অবস্থায় যা করেছি তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাই।” আজ নিজেকে একটু জিজ্ঞেস করি: আমি কি একা থাকলে আল্লাহর জন্য আমল করতে পারি? মানুষ না জানলেও কি আমি একই কাজ করতাম? প্রশংসা না পেলেও কি আমি এই আমল চালিয়ে যেতাম? আমি কি আল্লাহকে খুশি করতে চাই, নাকি মানুষের চোখে ভালো হতে চাই?

রিয়া এমন এক রোগ, যা আমলকে বাইরে থেকে সুন্দর কিন্তু ভেতরে থেকে ফাঁপা করে দিতে পারে। তাই আজ থেকেই চেষ্টা করি, মানুষের দৃষ্টি নয়, আল্লাহর দৃষ্টি বড় করে দেখি। মানুষ জানুক বা না জানুক, আল্লাহ জানেন, এটাই একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা।

আল্লাহ আমাদের অন্তরকে রিয়া থেকে হেফাজত করুন, ইখলাস দান করুন, এবং আমাদের আমলগুলোকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করে নিন। আমিন।

অধ্যায় ০২

উজব | নিজের ভালোত্বে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাওয়া

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

> **সূত্র ও সম্পাদকীয় নোট**
>
> সম্পাদকীয় সূত্র নোট: সূরা আন নাজম ৫৩:৩২ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হয়েছে, পূর্ণ আয়াত নয়। আমল ও আল্লাহর রহমতের বর্ণনার জন্য সহিহ বুখারি ৫৬৭৩ দেখুন।

একটা মানুষ ভালো কাজ করল। নামাজ ঠিক করল। কুরআন পড়া শুরু করল। দ্বীনি ইলম শিখল। পর্দা শুরু করল। হারাম ছেড়ে দিল। মানুষকে নসিহাহ করল। সবই ভালো। কিন্তু একসময় খুব নীরবে, খুব সূক্ষ্মভাবে তার অন্তরে আরেকটি জিনিস জন্ম নিল, “আমি তো অনেকের চেয়ে ভালো।” সে মুখে কথাটা বলে না। হয়তো নিজেও বুঝতে পারে না।

কিন্তু অন্যের ভুল দেখলে তার মনে নিজের ভালোত্বের অনুভূতি জাগে। কাউকে গুনাহ করতে দেখলে নিজের আমলের কথা মনে পড়ে। কেউ কম জানলে তাকে ছোট মনে হয়। কেউ নসিহাহ করলে অন্তরে বাধে, “এটা তো আমি জানিই!” আর ধীরে ধীরে সে আল্লাহর অনুগ্রহের চেয়ে নিজের অর্জনকে বেশি দেখতে শুরু করে।

এই রোগের নাম, উজব (العُجْب)। সহজ ভাষায়, নিজের আমল, জ্ঞান, যোগ্যতা বা দ্বীনদারিতে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাওয়া। রিয়া আর উজব এক জিনিস নয়। রিয়া চায়, মানুষ আমাকে দেখুক। উজব বলে, আমি নিজেই তো বেশ ভালো! রিয়ার জন্য দর্শক লাগে। উজবের জন্য কাউকে লাগে না।

একটি মানুষ একা ঘরেও নিজের ইবাদত, জ্ঞান, চরিত্র বা ত্যাগ নিয়ে মনে মনে এতটাই মুগ্ধ হতে পারে যে, সে ভুলে যায়: এই তাওফিক সে নিজে তৈরি করেনি। আল্লাহ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ

“তোমরা নিজেদের পবিত্র বলে দাবি করো না। কে প্রকৃত মুত্তাকি, তিনি তা সর্বাধিক জানেন।”, সূরা আন নাজম, ৫৩:৩২ কী গভীর সতর্কবাণী! আমি নিজেকে কী মনে করি, সেটাই শেষ সত্য নয়। আমি মনে করতে পারি, আমি ভালো মুসলিম। আমি মনে করতে পারি, আমার নিয়ত পরিষ্কার। আমি মনে করতে পারি, আমি অন্যদের চেয়ে বেশি বুঝি।

কিন্তু আমার অন্তরকে সবচেয়ে ভালো জানেন আল্লাহ। উজবের সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো, এটা অনেক সময় ভালো কাজের পরেই আসে। মানুষ যখন গুনাহে থাকে, তখন নিজের দুর্বলতা দেখতে পায়। কিন্তু যখন কিছু ভালো কাজ শুরু করে, তখন নফস তার কাছে অন্য দরজা খুলে দেয়: “দেখেছ? তুমি কিন্তু সাধারণ মানুষের মতো নও।” এখান থেকেই শুরু হতে পারে অন্তরের পতন। আপনি নামাজ পড়েন, তারপর নামাজ না পড়া মানুষকে তুচ্ছ ভাবেন। আপনি পর্দা করেন, তারপর অন্য নারীর ভুল দেখে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করেন। আপনি দ্বীনি ইলম শিখেছেন, তারপর সাধারণ মানুষের প্রশ্নে বিরক্ত হন।

আপনি হারাম ছেড়েছেন, তারপর এখনও সংগ্রামরত মানুষকে দেখে মনে করেন, “এরা এত দুর্বল কেন?”

আপনি তাহাজ্জুদ পড়েন, তারপর দিনের বেলায় নিজের ভেতরে অদৃশ্য একটি উচ্চতা নিয়ে হাঁটেন। তখন আমল আছে। কিন্তু আমলের সঙ্গে বিনয় কমে যাচ্ছে। এখানেই নিজেকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করা দরকার:

এই আমল আমাকে আল্লাহর সামনে আরও ছোট করছে, নাকি নিজের চোখে আরও বড় করছে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কারও আমল একা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না; এমনকি তিনি ﷺ-ও আল্লাহর রহমত ছাড়া নন। অর্থাৎ নেক আমল অপরিহার্য, কিন্তু বান্দা নিজের আমলকে মুক্তির স্বাধীন গ্যারান্টি মনে করতে পারে না, সে আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী। ভাবুন।

যে মানুষ আজ নামাজ পড়ছে, সে কি নিজের শক্তিতে পড়ছে?

আল্লাহ চাইলে তার হৃদয়ও তো ফিরিয়ে দিতে পারতেন। যে মানুষ আজ গুনাহে আছে, আল্লাহ চাইলে কাল তাকে এমন তাওবা দিতে পারেন, যার পর সে আপনার চেয়েও উত্তম অবস্থায় চলে যাবে।

আর আপনি?

আল্লাহ যদি এক মুহূর্তের জন্য তাওফিক তুলে নেন, আপনার নিজের কী ক্ষমতা আছে?

এই চিন্তা উজবকে ভেঙে দেয়।

🪞 উজবের কিছু সূক্ষ্ম লক্ষণ

নিজের মধ্যে মিলিয়ে দেখুন:

আপনি কি অন্যের ভুল দেখলে নিজের ভালোত্ব অনুভব করেন?

কেউ আপনাকে সংশোধন করলে কি ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হন?

মনে হয়, "এটা আমাকে শেখানোর দরকার নেই"?

আপনি কি নিজের দ্বীনি জ্ঞান, আমল, পর্দা, দাড়ি, দাওয়াহ বা ত্যাগ নিয়ে গোপনে মুগ্ধ?

কোনো ভালো কাজের পর কি "আল্লাহ তাওফিক দিয়েছেন" ভাবার আগে "আমি করেছি" অনুভূতি আসে?

অন্য কেউ আপনার চেয়ে ভালো করলে কি অস্বস্তি হয়?

নিজের পুরোনো গুনাহ ভুলে গিয়ে কি এখনকার ভালো অবস্থাকেই নিজের পরিচয় মনে করছেন?

সব লক্ষণ একসঙ্গে থাকতে হবে না। একটি লক্ষণও আমাদের থামিয়ে নিজের অন্তর দেখার জন্য যথেষ্ট।

তাহলে চিকিৎসা কী?

প্রথমত, তাওফিককে নিজের অর্জন ভাববেন না। আপনি নামাজ পড়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ডেকেছেন। আপনি গুনাহ ছেড়েছেন, আল্লাহ সাহায্য করেছেন। আপনি ইলম শিখেছেন, আল্লাহ দরজা খুলেছেন। তাওফিককে নিয়ামত হিসেবে দেখলে শোকর আসে। নিজের কৃতিত্ব হিসেবে দেখলে উজব আসে। দ্বিতীয়ত, নিজের অদৃশ্য ত্রুটির কথা মনে রাখুন। মানুষ আপনার বাহ্যিক ভালো দিক দেখে।

কিন্তু আপনি জানেন, আপনার কত গোপন দুর্বলতা আছে। কত নিয়তের সমস্যা আছে। কত নামাজে মন ছিল না। কত গুনাহ আল্লাহ ঢেকে রেখেছেন। নিজের বাস্তবতা জানলে আত্মমুগ্ধতার জায়গা ছোট হয়ে যায়। তৃতীয়ত, অন্যের শেষ পরিণতি নিয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন না। আজ যে দুর্বল,

সে কাল বদলে যেতে পারে। আজ আপনি ভালো আছেন, এটাও স্থায়ী গ্যারান্টি নয়। তাই গুনাহগারকে দেখে ঘৃণাভরে নয়; নিজের জন্য ভয় এবং তার জন্য হিদায়াতের দোয়া নিয়ে তাকান।

চতুর্থত, আমলের পর কবুলিয়াত চান। “আমি করেছি”, এই অনুভূতিতে শেষ করবেন না। বলুন, “হে আল্লাহ, আপনি তাওফিক দিয়েছেন। এখন কবুলও করুন। আমার আমলের ত্রুটি ক্ষমা করুন।” পঞ্চমত, নসিহাহ গ্রহণের অভ্যাস করুন। আপনাকে কেউ সংশোধন করলে প্রথম প্রতিক্রিয়া যেন না হয়, “আমি জানি।”

বরং ভাবুন, “আল্লাহ হয়তো এই মানুষের মাধ্যমে আমার একটি অদৃশ্য ভুল দেখাচ্ছেন।” --- আজকের সবচেয়ে কঠিন আত্মজিজ্ঞাসা:

আমি কি ভালো হতে চাই, নাকি ভালো মানুষ হিসেবে নিজের কাছে মুগ্ধ হতে চাই?

আমি কি অন্যের ভুল দেখে তার জন্য দোয়া করি, নাকি নিজের ভালোত্ব উপভোগ করি?

আমি কি আমলের পর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, নাকি নিজের প্রতি সম্মান বেড়ে যায়?

মনে রাখুন: গুনাহ আমাদের কাঁদাতে পারে। কিন্তু নিজের নেক আমলে মুগ্ধতা কখনো কখনো আমাদের কান্নার প্রয়োজনটাই ভুলিয়ে দেয়। আল্লাহ আমাদের ভালো আমল দিন, কিন্তু সেই আমল নিয়ে আত্মমুগ্ধতা থেকে হেফাজত করুন। আমাদের প্রতিটি তাওফিককে তাঁর অনুগ্রহ হিসেবে দেখতে শেখান। আমাদের অন্তরকে বিনয়ী রাখুন এবং শেষ পর্যন্ত হিদায়াতের ওপর অটল রাখুন। আমিন।

অধ্যায় ০৩

কিবর | অহংকার

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

> **সূত্র ও সম্পাদকীয় নোট**
>
> সম্পাদকীয় সূত্র নোট: সত্য প্রত্যাখ্যান ও মানুষকে তুচ্ছ করার সংজ্ঞাটি সহিহ মুসলিম ৯১a-তে আছে। কাউকে ব্যক্তিগতভাবে চূড়ান্ত ঈমান বা পরিণতির রায় দেওয়ার জন্য এই আত্মপর্যালোচনামূলক আলোচনা নয়।

একজন মানুষ হয়তো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। কুরআন পড়ে। হারাম থেকে বাঁচে। দ্বীনি ইলমও জানে। মানুষের সামনে ভদ্রভাবেও কথা বলে। কিন্তু তার অন্তরে খুব নীরবে একটি অনুভূতি বাসা বাঁধতে পারে, “আমি ওর চেয়ে ভালো।” সে হয়তো মুখে কাউকে অপমান করে না। কিন্তু গুনাহগার কাউকে দেখলে ভেতরে ভেতরে ছোট মনে করে। কেউ তাকে সংশোধন করলে তার ভালো লাগে না। কম শিক্ষিত মানুষের কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনতে পারে না। গরিব, দুর্বল, কম পরিচিত বা সামাজিকভাবে নিচু অবস্থানের মানুষের সঙ্গে আচরণে তার অদৃশ্য একটি পার্থক্য থাকে।

কেউ তার মতের বিরোধিতা করলে প্রথমে সত্য মিথ্যা যাচাই করে না; বরং মনে হয়, “আমাকে শেখাতে এসেছে?” এই রোগের নাম, কিবর (الكِبْر)। সহজ ভাষায়, অহংকার। কিন্তু অহংকার মানেই শুধু দামি পোশাক পরা, সুন্দরভাবে চলা বা আত্মবিশ্বাসী হওয়া নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ অহংকারের খুব স্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

অর্থাৎ: “অহংকার হলো সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ মনে করা।”, সহিহ মুসলিম এই একটি হাদিস আমাদের সামনে অহংকারের আসল চেহারা খুলে দেয়। অহংকারের দুটি বড় লক্ষণ: সত্য সামনে এলে তা মানতে কষ্ট হওয়া। আর মানুষকে নিজের চেয়ে ছোট মনে করা।

এ কারণেই একজন মানুষ খুব সাধারণ পোশাক পরেও অহংকারী হতে পারে। আবার একজন মানুষ সুন্দর পোশাক পরেও অহংকারী নাও হতে পারে। কারণ অহংকার কাপড়ে নয়। অহংকার অন্তরের অবস্থায়। --- উজব আর কিবর এক জিনিস নয় গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছি উজব নিয়ে। উজব হলো, “আমি বেশ ভালো।”

আর কিবর হলো, “আমি ওর চেয়ে ভালো।” উজবে মানুষ নিজের আমলে মুগ্ধ হয়। কিবরে সে অন্যকে নিচু দেখে। উজব নিজের দিকে তাকিয়ে ফুলে ওঠে। কিবর অন্যের দিকে তাকিয়ে তাকে ছোট করে। দুটো রোগ খুব কাছাকাছি। অনেক সময় নিজের ভালোত্বে মুগ্ধ হওয়া থেকেই অন্যকে ছোট দেখার শুরু হয়।

মানুষ মনে করে, আমি নামাজ পড়ি, সে পড়ে না। আমি পর্দা করি, সে করে না। আমি দ্বীন বুঝি, সে বোঝে না। আমি হারাম ছেড়েছি, সে এখনও গুনাহে আছে।

আমি এত কিছু জানি, আর সে কী জানে?

ধীরে ধীরে একটি ভয়ংকর পরিবর্তন ঘটে। মানুষ আর আল্লাহর নিয়ামত দেখে না। সে নিজের মর্যাদা দেখতে শুরু করে। আর অন্যের দুর্বলতা দেখে তার জন্য কষ্ট পাওয়ার বদলে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করে। এটাই কিবরের দরজা। --- আল্লাহ তাআলা বলেন: “মানুষের প্রতি অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং পৃথিবীতে অহংকারের সঙ্গে চলাফেরা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো অহংকারী ও আত্মগর্বীকে পছন্দ করেন না।”, সূরা লুকমান, ৩১:১৮

লক্ষ্য করুন, অহংকার শুধু আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের সঙ্গে আচরণেও অহংকার প্রকাশ পায়।

আপনি কীভাবে একজন গরিবের সঙ্গে কথা বলেন?

আপনার চেয়ে কম শিক্ষিত কেউ কিছু বললে কীভাবে শোনেন?

আপনার ছোট ভাই বা বোন আপনাকে সংশোধন করলে কেমন লাগে?

স্ত্রী বা স্বামী কোনো ভুল ধরিয়ে দিলে অন্তর কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়?

একজন সাধারণ মানুষ আপনার মতের বিরোধিতা করলে আপনি যুক্তি দেখেন, নাকি তার পরিচয় দেখেন?

এখানেই অন্তরের পরীক্ষা। --- অহংকারের সবচেয়ে সূক্ষ্ম জায়গা, সত্য গ্রহণ করা আমরা প্রায়ই ভাবি, অহংকার মানে কাউকে গালি দেওয়া বা বুক ফুলিয়ে হাঁটা। কিন্তু হাদিসের সংজ্ঞা অনুযায়ী অহংকারের প্রথম অংশই হলো, সত্য প্রত্যাখ্যান করা। ধরুন, আপনি কোনো বিষয়ে ভুল করেছেন। কেউ প্রমাণসহ আপনাকে সংশোধন করল। কিন্তু আপনি ভুল স্বীকার করলেন না।

কেন?

কারণ সে আপনার চেয়ে ছোট। কারণ সে কম পড়াশোনা করেছে। কারণ সে নতুন দ্বীনে এসেছে। কারণ সে আপনার follower। কারণ আপনি বহু বছর ধরে এই কাজ করছেন। তখন সমস্যা শুধু ভুলের নয়। সমস্যা হলো, সত্যের সামনে নফস দাঁড়িয়ে গেছে। অহংকারী মানুষ অনেক সময় সত্যকে হারাতে চায় না।

সে চায়, নিজে যেন না হারে। সত্য কী, এটা তখন দ্বিতীয় বিষয় হয়ে যায়। “কে বলেছে?”, এটাই বড় হয়ে যায়। --- দ্বীনদারিতার মধ্যেও অহংকার আসতে পারে এটা খুব কষ্টের সত্য। একজন মানুষ গুনাহ করতে করতে অহংকারী হতে পারে। আবার একজন মানুষ ইবাদত করতে করতেও অহংকারী হতে পারে।

সে ভাবতে পারে, “আমি অন্তত ওদের মতো না।” “এতটুকু দ্বীনও বোঝে না?” “আমি হলে এই গুনাহ করতাম না।” “আমাদের সময় আমরা কত কষ্ট করে দ্বীন শিখেছি!” “ওরা শুধু নতুন নতুন ইসলাম শিখেছে।” তখন দ্বীন তাকে বিনয়ী করার বদলে তার নফসকে একটি নতুন পরিচয় দেয়, “আমি ভালো মুসলিম।”

এখানেই ভয়। কারণ আমরা জানি না, যাকে আজ আমরা গুনাহগার মনে করছি, আল্লাহ কাল তাকে কেমন তাওবা দান করবেন। যাকে আজ অজ্ঞ মনে করছি, আল্লাহ কাল তাকে কত ইলম দেবেন। যাকে আজ দুর্বল ভাবছি, তার অন্তরে হয়তো এমন ইখলাস আছে, যা আমাদের নেই।

আর আমরা?

আমাদের শেষ পরিণতি কী হবে, আমরাও জানি না। তাই একজন মুমিন অন্যের গুনাহ দেখে নিজের জন্য নিরাপত্তা অনুভব করে না। বরং সে ভাবে, “আল্লাহ আমাকে হেফাজত না করলে আমিও হতে পারতাম।” ---

অহংকারের কিছু সূক্ষ্ম লক্ষণ

নিজেকে দোষী ঘোষণা করার জন্য নয়। নিজেকে যাচাই করার জন্য মিলিয়ে দেখুন:

কেউ সংশোধন করলে কি আপনার প্রথম প্রতিক্রিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন?

ভুল স্বীকার করতে কি খুব কষ্ট হয়?

আপনার চেয়ে কম জ্ঞানী কারও কাছ থেকে শেখা কি কঠিন লাগে?

কাউকে গুনাহে দেখলে তার জন্য দোয়ার আগে কি নিজের ভালোত্ব মনে পড়ে?

আপনি কি মানুষকে তার অর্থ, শিক্ষা, বংশ, পেশা বা সামাজিক অবস্থান দিয়ে মূল্যায়ন করেন?

কেউ আপনার সঙ্গে disagree করলে কি মনে হয়, সে আপনাকে অসম্মান করেছে?

আপনার কথা গুরুত্ব না পেলে কি খুব রাগ হয়?

আপনি কি ক্ষমা চাইতে দেরি করেন, কারণ মনে হয়, "আমি আগে কেন যাব?"

আপনি কি পরিবারের মানুষের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন, যেভাবে বাইরের সম্মানিত মানুষের সঙ্গে কখনো বলতেন না? এই প্রশ্নগুলো সহজ নয়। কিন্তু অন্তরের রোগের চিকিৎসাও আয়নায় না তাকিয়ে হয় না। ---

অহংকারের চিকিৎসা কী?

১. নিজের শুরুটা মনে রাখুন

মানুষ কী নিয়ে অহংকার করে?

চেহারা?

একদিন তা বদলে যাবে।

সম্পদ?

এক মুহূর্তে চলে যেতে পারে।

জ্ঞান?

আপনি যা জানেন না, তা আপনার জানা বিষয়ের চেয়ে অনেক বেশি।

ইবাদত?

তাওফিক আল্লাহ দিয়েছেন।

বংশ?

আপনি নিজে নির্বাচন করেননি।

ক্ষমতা?

সবই অস্থায়ী। নিজের বাস্তবতা মনে রাখলে অহংকারের জায়গা ছোট হয়ে যায়। ---

২. সত্যকে সত্যের কারণে গ্রহণ করুন

নিজেকে একটি অভ্যাস শেখান, সত্য কে বলেছে, তার আগে দেখুন, কথাটি সত্য কি না। আপনার সন্তান বললেও। আপনার কর্মচারী বললেও। আপনার ছোট ভাই বললেও। আপনার বিরোধী বললেও। সত্য গ্রহণ করলে আপনি ছোট হন না। বরং নফস ছোট হয়। আর এটাই তো দরকার। ---

৩. যাদের ছোট মনে হয়, তাদের জন্য দোয়া করুন

কারও দুর্বলতা দেখলে অন্তরে শ্রেষ্ঠত্ব আসছে?

সঙ্গে সঙ্গে বলুন, “হে আল্লাহ, তাকে হিদায়াত দিন এবং আমাকে আমার নফসের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।” দোয়া contempt-কে compassion-এ বদলে দিতে সাহায্য করে। মানুষ তখন আর আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের মাধ্যম থাকে না। সে একজন বান্দা হয়ে যায়, যারও আল্লাহর রহমত দরকার, যেমন আপনার দরকার। ---

৪. ভুল স্বীকার করার অনুশীলন করুন

তিনটি কথা অহংকারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ওষুধ, “আমি ভুল করেছি।” “আমি জানি না।” “আপনি ঠিক বলেছেন।” নফস এগুলো বলতে চায় না। তাই সচেতনভাবে বলুন। ক্ষমা চাইলে মর্যাদা কমে না। ভুল মানলে জ্ঞান কমে না। সত্য গ্রহণ করলে সম্মান নষ্ট হয় না। বরং অন্তর পরিষ্কার হয়। ---

৫. নিজের গোপন ত্রুটিগুলো মনে রাখুন

মানুষ আপনার ভালো দিক দেখে। কিন্তু আপনি জানেন, কত নামাজে মন ছিল না। কত নিয়ত মিশ্র ছিল। কত গুনাহ আল্লাহ ঢেকে রেখেছেন। কতবার আপনি নিজেকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভেঙেছেন।

আল্লাহ যদি সব প্রকাশ করে দিতেন, মানুষ কি এখনও আপনাকে একইভাবে দেখত?

এই প্রশ্ন অহংকারকে কাঁপিয়ে দেয়। --- আজ নিজেকে জিজ্ঞেস করি:

আমি কি সত্যকে ভালোবাসি, নাকি শুধু নিজের সঠিক হওয়াকে ভালোবাসি?

আমি কি গুনাহগার মানুষকে দেখে তার জন্য কষ্ট পাই, নাকি নিজের ভালোত্ব উপভোগ করি?

আমাকে সংশোধন করা হলে কি আমি শিখি, নাকি লড়াই করি?

আমি কি মানুষকে সম্মান করি কারণ সে আল্লাহর বান্দা, নাকি শুধু তখন, যখন সে আমার সমান বা উপরের?

মনে রাখুন, অহংকার শুধু “আমি বড়” বলার নাম নয়। কখনো অহংকার হলো, “সে আমার সমান নয়”, এই নীরব অনুভূতি। আল্লাহ আমাদের অন্তরকে কিবর থেকে হেফাজত করুন। সত্যকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করার বিনয় দিন। কোনো মানুষকে তুচ্ছ না ভাবার তাওফিক দিন। আমাদের ভালো আমলকে নফসের খাদ্য নয়, বিনয়ের কারণ বানিয়ে দিন। আমিন।

অধ্যায় ০৪

অন্যের ভালো দেখে বুক জ্বলে? সাবধান, এটা হিংসা হতে পারে

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

> **সূত্র ও সম্পাদকীয় নোট**
>
> সম্পাদকীয় সূত্র নোট: আন নিসা ৪:৫৪ এর উদ্ধৃতিটি আয়াতের অংশ। হিংসা পরিহার ও ভাইয়ের কল্যাণ কামনার বর্ণনা মুসলিম ২৫৬৪a ও বুখারি ১৩ এর সঙ্গে বিষয়গতভাবে মিলেছে।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কখনো কি এমন হয়েছে, কারো রিজিক বাড়ছে, কারো বিয়ে হয়ে গেছে, কারো পড়াশোনায় ভালো হচ্ছে, কারো দ্বীনি অগ্রগতি হচ্ছে, কারো প্রতি মানুষ সম্মান দেখাচ্ছে... আর সেটা দেখে আপনার অন্তরে একধরনের অস্বস্তি কাজ করছে? বাইরে হয়তো আপনি হাসিমুখে অভিনন্দন জানিয়েছেন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কেমন যেন একটা চাপা কষ্ট, অশান্তি, বা অজানা জ্বালা কাজ করছে।

এই অনুভূতিটা খুব সাধারণ মনে হলেও, সবসময় নিরীহ নয়। অনেক সময় এটি শুধু comparison না; এটি হতে পারে হাসাদ, হিংসা। আর এই হিংসা এমন একটি অন্তরের রোগ, যা মানুষকে অন্যের ক্ষতি চাইতে শিখায়, নিজের শান্তি নষ্ট করে, এবং ধীরে ধীরে ঈমানি সৌন্দর্যকে ক্ষয় করে দেয়।

হিংসা মানে শুধু এটা নয় যে, “ওর জিনিসটা আমারও চাই।” বরং হিংসার আসল রূপ হলো, আল্লাহ অন্যকে যে নিয়ামত দিয়েছেন, সেটা তার কাছে না থাকুক, অন্তরে অন্তরে এমনটা চাওয়া। এই জায়গাটাই খুব ভয়ংকর। কারণ তখন সমস্যা শুধু দুনিয়াবি প্রতিযোগিতা থাকে না; তখন বান্দা যেন আল্লাহর বণ্টন নিয়েই অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“নাকি তারা মানুষকে এ কারণে হিংসা করে যে, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে দান করেছেন?” সূরা আন নিসা, ৪:৫৪ আর সূরা আল ফালাকে আমরা প্রতিদিন পড়ি, সেখানে আল্লাহ আমাদের শিখিয়েছেন:

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

“এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।” সূরা আল ফালাক, ১১৩:৫ খেয়াল করুন, হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে। কেন? কারণ হিংসা শুধু অন্যের ক্ষতিই করে না, আগে হিংসুকের নিজের অন্তরকেই অন্ধকার করে দেয়। সে আর স্বাভাবিকভাবে মানুষের ভালো দেখতে পারে না। অন্যের সুখ তার কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যের সাফল্য তাকে অনুপ্রাণিত করার বদলে ভেঙে দেয়। এভাবে ধীরে ধীরে সে কৃতজ্ঞতা হারায়, দোয়া হারায়, মানসিক শান্তি হারায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “তোমরা একে অপরকে হিংসা করো না...”, সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৫৬৪ আরেকটি হাদিসে তিনি ﷺ বলেছেন:

“তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা ই ভালোবাসে, যা সে নিজের জন্য ভালোবাসে।”, সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৪৫ এই হাদিসটি আমাদের অন্তর পরীক্ষা করার এক অসাধারণ মাপকাঠি। আমি কি সত্যিই অন্যের ভালোতে খুশি হতে পারি? আমি কি চাই আল্লাহ আমার ভাই/বোনকেও ভালো রাখুন? নাকি আমি চাই, ভালোটা শুধু আমার দিকেই থাকুক?

আজকের social media culture এই রোগকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিনিয়ত আমরা অন্যের সুখ, অর্জন, উপহার, ভ্রমণ, বিয়ে, চাকরি, দ্বীনি image, সবকিছু দেখি। তারপর অজান্তেই নিজের জীবনকে ছোট ভাবতে শুরু করি। সেখান থেকে জন্ম নেয় comparison, comparison থেকে অশান্তি, আর অশান্তি থেকে হিংসা। অথচ আমরা ভুলে যাই, আল্লাহর দেয়া রিযিক, সম্মান, হিদায়াহ, গ্রহণযোগ্যতা, সবই পরীক্ষা। অন্যের নিয়ামত দেখে পুড়তে থাকা কোনো সমাধান না; বরং আল্লাহর কাছে নিজের জন্য কল্যাণ চাওয়া ই মুমিনের পথ।

তাহলে এই রোগ থেকে বাঁচার উপায় কী?

প্রথমত, নিজের অন্তরের রোগকে রোগ হিসেবে স্বীকার করতে হবে। “না না, আমি হিংসা করি না”, বলে এড়িয়ে গেলে হবে না। কারো ভালোতে যদি অন্তর কষ্ট পায়, তবে নিজের সঙ্গে সৎ হতে হবে। দ্বিতীয়ত, সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য দোয়া করুন। অন্তরে কষ্ট লাগলে বলুন, “আল্লাহুম্মা বারিক লাহু / লাহা”, হে আল্লাহ, তার জন্য বরকত দিন। শুরুতে কষ্ট হবে, কিন্তু এই আমল অন্তরকে ধীরে ধীরে পরিষ্কার করে।

তৃতীয়ত, নিজের নিয়ামতগুলো গুনে দেখুন। শয়তান আপনাকে সবসময় যা নেই সেটাই দেখাতে চায়; আর শোকর আপনাকে যা আছে তা চিনতে শেখায়। হিংসা শোকরের বিপরীত। চতুর্থত, comparison কমান। সবকিছু দেখতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যেসব content আপনার অন্তরকে অস্থির করে তোলে, সেগুলো থেকে দূরে থাকাও আত্মশুদ্ধির অংশ।

পঞ্চমত, হিংসা আর গিবতাহর পার্থক্য বুঝুন। অন্যের ভালো দেখে “আল্লাহ, আমাকেও এমন ভালো দান করুন”, এটা ভালো। কিন্তু “ওরটা থাকুক না”, এটাই হিংসা, আর এটাই অন্তরের আগুন। একটু ভেবে দেখুন: আমি কি অন্যের সুখে খুশি হতে পারি? কারো দ্বীনি অগ্রগতি দেখে আমি অনুপ্রাণিত হই, নাকি অস্বস্তি বোধ করি? আমি কি আল্লাহর বণ্টনের ওপর সন্তুষ্ট? আমি কি নিজের ঘাটতি পূরণের চেয়ে অন্যের নিয়ামত কমে যাক, এমন অনুভূতি পোষণ করি?

মনে রাখবেন, হিংসা নিয়ে বেঁচে থাকা মানে নিজের অন্তরে আগুন বহন করা। এতে যার প্রতি হিংসা করা হচ্ছে, তার ক্ষতি হোক বা না হোক, আগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিজের রূহ, নিজের সওয়াব, নিজের প্রশান্তি। একজন মুমিনের অন্তর হওয়া উচিত পরিষ্কার, উদার, দোয়াময়। অন্যের ভালো দেখে অন্তর কাঁদবে না; বরং বলবে, “ইয়া আল্লাহ, তাকেও ভালো রাখুন, আমাকেও হালাল ও কল্যাণময় নিয়ামত দান করুন।”

আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরকে হিংসা, কিবর, রিয়া, হিংস্রতা ও কালিমা থেকে পবিত্র করুন। আমাদের এমন অন্তর দান করুন, যে অন্তর অন্যের ভালোতে কষ্ট পায় না; বরং দোয়া করে, ভালোবাসে, এবং আপনার ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকে। আমিন।

অধ্যায় ০৫

কুধারণা | প্রমাণ ছাড়াই মানুষের ব্যাপারে খারাপ ভাবা

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

> **সূত্র ও সম্পাদকীয় নোট**
>
> সম্পাদকীয় সূত্র নোট: আল হুজুরাত ৪৯:১২ এর আরবি ও বাংলা প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। কুধারণার হাদিসের নির্দিষ্ট ঠিকানা সহিহ বুখারি ৬০৬৪।

একজন মানুষ আপনার message-এর reply দিল না। মনে হলো, “ইচ্ছা করেই ignore করছে।” কেউ আপনাকে দেখে সালাম দিল না। মনে হলো, “অহংকার বেড়ে গেছে।” দুইজন মানুষ আপনার সামনে কথা বলা থামিয়ে দিল। মনে হলো, “নিশ্চয়ই আমাকে নিয়েই কথা বলছিল।” কেউ আপনার পোস্টে react করল না। মনে হলো, “আমার ভালো সহ্য করতে পারে না।” কেউ একটু চুপচাপ কথা বলল। মনে হলো, “নিশ্চয়ই আমার ওপর রাগ করেছে।”

কোনোটারই হয়তো প্রমাণ নেই। কিন্তু আমাদের মন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটি গল্প বানিয়ে ফেলল। তারপর সেই গল্পকেই আমরা সত্য মনে করতে শুরু করলাম। এই অন্তরের রোগের নাম, কুধারণা:سوء الظن অর্থাৎ, যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়া কারও কথা, আচরণ, নিয়ত বা উদ্দেশ্যকে খারাপভাবে ব্যাখ্যা করা। সমস্যা হলো, কুধারণা শুধু মনে এসে চলে যায় না। এটি ধীরে ধীরে: সম্পর্ক নষ্ট করে, অন্তরে বিদ্বেষ তৈরি করে, গীবতের দরজা খোলে, মানুষকে এড়িয়ে চলতে শেখায়, এবং এমন অপরাধের জন্যও কাউকে দোষী বানায়, যেটা সে হয়তো কখনো করেইনি। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

“হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয়ই কিছু ধারণা গুনাহ।” সূরা আল হুজুরাত, ৪৯:১২ লক্ষ্য করুন…. আল্লাহ শুধু গীবত থেকে বাঁচতে বলেননি। তার আগেই বলেছেন, ধারণা থেকে বাঁচো। কারণ অনেক সময় গুনাহ জিহ্বায় শুরু হয় না। অন্তরে শুরু হয়। প্রথমে আমরা খারাপ ধারণা করি। তারপর সেই ধারণার পক্ষে প্রমাণ খুঁজি। তারপর অন্যের কাছে বলি, “আমার মনে হয়…” “আমি নিশ্চিত না, তবে…” “ওর আচরণ দেখে তো বুঝতেই পারছ…” এভাবেই একটি প্রমাণহীন ধারণা ধীরে ধীরে মানুষের চরিত্র সম্পর্কে verdict হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

“তোমরা কুধারণা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ কুধারণা কথার মধ্যে সবচেয়ে মিথ্যা।” সহিহ বুখারি; সহিহ মুসলিম কী গভীর কথা! কারণ কুধারণার ভয়ংকর দিক হলো, আমরা এমন একটি কথা নিজের মনে সত্য বানিয়ে ফেলি, যার কোনো প্রমাণই নেই।

মানুষ হয়তো ব্যস্ত ছিল। আপনি ভাবলেন, অহংকার করেছে। মানুষ হয়তো কষ্টে ছিল। আপনি ভাবলেন, আপনাকে অপছন্দ করে। মানুষ হয়তো আপনার কথা শুনতেই পায়নি। আপনি ভাবলেন, ইচ্ছা করে ignore করেছে। মানুষ হয়তো নিজের সমস্যায় চুপ ছিল। আপনি ভাবলেন, আপনার বিরুদ্ধে কিছু চলছে। বাস্তবতা একটি। কিন্তু নফস আর শয়তান মিলে তার দশটি অন্ধকার ব্যাখ্যা তৈরি করে।

কুধারণা কেন এত সহজে জন্মায়? অনেক সময় কারণটা অন্য মানুষ না। কারণটা আমাদের নিজের অন্তর।

যে মানুষ নিজে প্রতারণা করে, সে অন্যকেও সহজে প্রতারক ভাবে। যে মানুষ নিজে মানুষের পেছনে কথা বলে, সে মনে করে, সবাই তাকে নিয়েও কথা বলে। যার ভেতরে insecurity বেশি, সে neutral আচরণকেও rejection মনে করে। যার পুরোনো কষ্ট সারেনি, সে নতুন সম্পর্কেও পুরোনো ভয় দেখতে পায়। যে সবসময় comparison করে, সে অন্যের সাফল্যের ভেতরেও নিজের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা খুঁজে পায়।

তাই কখনো কখনো অন্য মানুষকে বিচার করার আগে নিজেকে জিজ্ঞেস করা দরকার, “আমি যা ভাবছি, সেটা কি সত্যিই তার আচরণের প্রমাণ, নাকি আমার নিজের ভয়, অভিজ্ঞতা ও insecurity-এর ছায়া?” কুধারণা আর সতর্কতা এক জিনিস নয় এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভারসাম্য আছে।

ইসলাম আমাদের সরল সোজা হয়ে প্রতারণার শিকার হতে বলে না। কাউকে নিয়ে বাস্তব evidence থাকলে, repeated harmful behaviour থাকলে, বিশ্বাসযোগ্য warning থাকলে, সতর্ক হওয়া যায়। কিন্তু..... সতর্কতা প্রমাণের ওপর দাঁড়ায়। কুধারণা অনুমানের ওপর দাঁড়ায়। সতর্কতা বলে, “কিছু evidence আছে, তাই সীমা রাখছি।” কুধারণা বলে, “প্রমাণ নেই, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সে খারাপ।” এ দুটো এক নয়। কুধারণার কিছু সূক্ষ্ম লক্ষণ নিজেকে দোষী বানানোর জন্য নয়। নিজেকে চিনতে মিলিয়ে দেখুন:

কেউ reply দিতে দেরি করলে কি আপনি সঙ্গে সঙ্গে negative meaning বের করেন? মানুষের কথা শেষ হওয়ার আগেই কি তার উদ্দেশ্য ধরে ফেলেন? কেউ আপনাকে না ডাকলে কি মনে হয়, ইচ্ছা করে বাদ দিয়েছে? দুইজনকে একসঙ্গে কথা বলতে দেখে কি মনে হয়, আপনাকে নিয়েই বলছে? কেউ আপনার সঙ্গে disagree করলে কি মনে হয়, সে আপনাকে অপছন্দ করে? কোনো ঘটনার একটি ভালো এবং একটি খারাপ ব্যাখ্যা সম্ভব হলে, আপনি কি স্বাভাবিকভাবে খারাপটাই বেছে নেন? কেউ আপনার ভুল ধরিয়ে দিলে কি মনে হয়, সে আপনাকে ছোট করতে চায়? আপনি কি মানুষের মুখের expression, online status, seen, react, tone, এসব থেকে পুরো গল্প বানিয়ে ফেলেন?

এই অভ্যাসগুলো ছোট মনে হতে পারে। কিন্তু এগুলো অন্তরের শান্তি কেড়ে নেয়। কুধারণার সবচেয়ে বড় ক্ষতি, আপনি মানুষকে তার আসল কাজের জন্য নয়, নিজের কল্পনার জন্য শাস্তি দিতে শুরু করেন কেউ কিছু করেনি। তবুও আপনি দূরে সরে গেলেন। কথা বন্ধ করলেন। মুখ ভার করলেন। অন্যদের কাছে অভিযোগ করলেন। সম্পর্কে দেয়াল তুললেন।

তারপর সেই মানুষ হয়তো বুঝতেই পারল না, সে কী অপরাধ করেছে। এভাবে আমরা কখনো কখনো নিজের মনে আদালত বসাই। নিজেই অভিযোগ করি। নিজেই প্রমাণ বানাই। নিজেই verdict দিই। তারপর অন্য মানুষকে সেই অপরাধের শাস্তি দিই, যা হয়তো সে কখনো করেনি।

Social media কুধারণাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে “Seen করেছে, reply দেয়নি।” “আমার story দেখেছে, react করেনি।” “ওই পোস্টে comment করেছে, আমারটায় করেনি।” “Online ছিল, কিন্তু আমাকে message দেয়নি।” “আমাকে unfollow করেছে নিশ্চয়ই...” একটি digital action থেকে আমরা কত বড় বড় conclusion বানাই!

কিন্তু আমরা জানি না, মানুষের মানসিক অবস্থা কী। তার পরিবারে কী চলছে। সে কতটা ব্যস্ত। সে message দেখেও পরে ভুলে গেছে কি না। সে আদৌ আমাদের নিয়ে ভাবছে কি না। অনেক সময় যে মানুষটিকে নিয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কষ্ট পাচ্ছি, সে হয়তো জানেই না যে আমরা তার ওপর রাগ করে আছি।

তাহলে চিকিৎসা কী?

১. ধারণা আর সত্যকে আলাদা করুন

নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, “আমি কি জানি, নাকি শুধু ভাবছি?”

এই একটি প্রশ্ন অনেক সমস্যা থামিয়ে দিতে পারে। “সে আমাকে অপছন্দ করে”, এটা কি fact?

নাকি interpretation? “ও ইচ্ছা করে করেছে”, প্রমাণ আছে?

নাকি অনুমান? মনের প্রতিটি কথা সত্য নয়।

২. ভালো ব্যাখ্যার জায়গা রাখুন

একটি ঘটনা যদি দশভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তবে সবসময় সবচেয়ে অন্ধকার ব্যাখ্যাই কেন? সে ব্যস্ত হতে পারে। ভুলে যেতে পারে। কষ্টে থাকতে পারে। বুঝতে না ও পারে। ভুল করতে পারে। মানুষকে angel ভাবতে হবে না। কিন্তু evidence ছাড়া villain-ও বানাবেন না।

৩. সম্ভব হলে সরাসরি জিজ্ঞেস করুন

মনে মনে শত গল্প বানানোর চেয়ে একটি respectful question অনেক ভালো। বলুন… “আপনার আচরণে আমি একটু confused হয়েছি। কোনো সমস্যা হয়েছে কি?” অনেক সম্পর্ক শুধু এই একটি প্রশ্নের অভাবে ভেঙে যায়। আমরা জিজ্ঞেস করি না। ধরে নিই। তারপর কষ্ট পাই।

৪. মানুষের অন্তর পড়ার চেষ্টা বন্ধ করুন

আপনি কাজ দেখতে পারেন। কথা শুনতে পারেন। কিন্তু অন্তরের নিয়ত? তা আল্লাহ জানেন। কেউ সদকা করেছে, “দেখানোর জন্য করেছে।” কেউ দ্বীনি পোস্ট দিয়েছে, “followers বাড়ানোর জন্য।” কেউ চুপ আছে..... “অহংকারী।” কেউ কথা বলছে “attention চায়।”

এভাবে চললে পৃথিবীতে কোনো কাজই ভালো থাকবে না। কারণ আমরা কাজের বিচার না করে অন্তরের অদৃশ্য উদ্দেশ্যের বিচারক হয়ে যাই।

৫. নিজের অন্তরের নিরাপত্তাহীনতা চিনুন

কখনো কুধারণা অন্যের চরিত্র থেকে নয়। নিজে ভয় থেকে আসে। তাই নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কেন এত দ্রুত rejection অনুভব করি? আমি কেন সবকিছু personal নিই? আমি কেন মনে করি সবাই আমাকে নিয়েই ভাবছে? আমি কি পুরোনো কষ্ট নতুন মানুষের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছি? এই প্রশ্নগুলো uncomfortable। কিন্তু healing-ও এখান থেকেই শুরু হয়। আজ নিজেকে জিজ্ঞেস করি:

আমি কি মানুষকে তার কাজ অনুযায়ী বিচার করি, নাকি নিজের কল্পনা অনুযায়ী?

আমি কি প্রমাণ ছাড়া মানুষের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করি?

আমি কি কারও একটি ভুল আচরণ দিয়ে তার পুরো চরিত্র বিচার করি?

আমি কি এমন কোনো মানুষের ওপর রাগ করে আছি, যে জানেই না সে কী ভুল করেছে?

আল্লাহ আমাদের এমন অন্তর দিন, যা সতর্ক কিন্তু সন্দেহপ্রবণ নয়; বুদ্ধিমান কিন্তু অন্যায় বিচারক নয়; মানুষের ভুল দেখে সংশোধন করে, কিন্তু প্রমাণ ছাড়া মানুষের নিয়তকে দোষী বানায় না। আল্লাহ আমাদের অন্তরকে কুধারণা, সন্দেহ, গীবত ও বিদ্বেষ থেকে পবিত্র করুন। আমিন।

অধ্যায় ০৬

হুব্বুল মাদহ | প্রশংসার নেশা

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

> **সূত্র ও সম্পাদকীয় নোট**
>
> সম্পাদকীয় সূত্র নোট: অতিরিক্ত প্রশংসা ও সীমিত মূল্যায়নের নির্দেশনার নির্দিষ্ট সূত্র সহিহ বুখারি ২৬৬২। আন নাজম ৫৩:৩২ এর উদ্ধৃতিটি আয়াতের অংশ।
>
> প্রশংসা ও নিয়ত: প্রশংসা পাওয়া মাত্র নিজের আমল নষ্ট হয়েছে ধরে নেবেন না। আলোচনার লক্ষ্য প্রশংসার জন্য কাজ করা ও সত্যকে ছাড় দেওয়া; স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা সম্পর্কে সহিহ মুসলিম ২৬৪২a-এর সুসংবাদও মনে রাখতে হবে।
>
> সহিহ মুসলিম ২৬৪২a

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। একটি ভালো কাজ করলেন। কাউকে সাহায্য করলেন, কোনো দ্বীনি পোস্ট লিখলেন, সুন্দর করে তিলাওয়াত করলেন, ক্লাস নিলেন, একটি দায়িত্ব ঠিকভাবে আদায় করলেন, কিংবা নীরবে কোনো খেদমত করলেন। কাজ শেষ হওয়ার পর আপনার অন্তরে খুব সূক্ষ্মভাবে একটি অপেক্ষা জেগে উঠল, কেউ কিছু বলবে না? কেউ লক্ষ্য করল না? কেউ “মাশাআল্লাহ” বলল না?

তারপর যদি কেউ প্রশংসা করে, মনটা হালকা হয়ে যায়। আর যদি কেউ কিছু না বলে, মনে হয়, কাজটা যেন মূল্যই পেল না। কেউ অন্য কাউকে প্রশংসা করলে বুকের ভেতরে কেমন একটা চাপা অস্বস্তি হয়। কেউ সমালোচনা করলে সেই কথাটাই অনেকক্ষণ ধরে মাথায় ঘোরে। কেউ আপনার অবদান উল্লেখ না করলে কষ্ট লাগে। এমনকি কখনো কখনো মনে হয়, মানুষের স্বীকৃতি না পেলে আমি যা করছি, তার কি আদৌ কোনো দাম আছে?

এই সূক্ষ্ম অন্তরের রোগের নাম, হুব্বুল মাদহ, অর্থাৎ প্রশংসাপ্রীতি, মানুষের মুখে নিজের প্রশংসা শুনতে চাওয়ার নেশা। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝতে হবে। রিয়া আর হুব্বুল মাদহ এক জিনিস নয়, যদিও তারা একে অপরের খুব কাছাকাছি। রিয়ায় মানুষ কাজ করে বা কাজকে সাজায় মানুষের দেখার জন্য। আর হুব্বুল মাদহে মানুষ কাজের পর মানুষের প্রশংসা, স্বীকৃতি, সম্মান আর

বাহবা পেতে চায়। রিয়া বলে, “মানুষ দেখুক আমি কী করছি।” আর হুব্বুল মাদহ বলে, “মানুষ বলুক আমি কত ভালো।” বাহ্যিকভাবে দুটো আলাদা মনে হলেও, দুটোই ইখলাসের জন্য বড় হুমকি।

এই রোগের সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো, এটা মানুষকে ধীরে ধীরে আল্লাহর কবুলিয়াত থেকে মানুষের approval-এর দিকে সরিয়ে নেয়। তখন ভালো কাজ করার পর বান্দা ভাবতে থাকে না, “আল্লাহ কবুল করলেন তো?” বরং তার ভেতরে প্রশ্ন জাগে, “মানুষ notice করল তো?” “কে কী বলল?” “আমার contribution বুঝল তো?” “আমার নামটা বলল না কেন?” ধীরে ধীরে আল্লাহর সন্তুষ্টির জায়গায় মানুষের প্রশংসা এসে বসে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ

“তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে ঘোষণা করো না। কে প্রকৃত মুত্তাকি, তিনি তা ভালো জানেন।” সূরা আন নাজম : ৩২ এই আয়াত শুধু মুখে নিজের গুণগান করা নিষেধ করছে না; বরং আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে, মানুষের চোখে ভালো হওয়া আর আল্লাহর কাছে কবুল হওয়া এক জিনিস নয়। আমি মানুষের সামনে যতই সুন্দর দেখাই না কেন, আমার অন্তরের আসল অবস্থা আল্লাহই জানেন। তাই মানুষের প্রশংসা আমাকে বিভ্রান্ত করতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কাছে তা কোনো গ্যারান্টি নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এক ব্যক্তি অন্য একজনকে অতিরিক্ত প্রশংসা করল। তখন তিনি ﷺ বললেন, “তুমি তার ঘাড় ভেঙে দিলে”, অর্থাৎ এ ধরনের অতিরিক্ত প্রশংসা মানুষকে অন্তর থেকে নষ্ট করে দিতে পারে। তারপর তিনি শিখিয়েছেন, যদি কাউকে প্রশংসা করতেই হয়, তাহলে সীমিতভাবে বলতে হবে, “আমি তাকে এমন মনে করি, আর আল্লাহই তার প্রকৃত হিসাবের অধিক জানেন।”, সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম

এই হাদিসে খুব বড় একটা শিক্ষা আছে। আমরা সাধারণত প্রশংসাকে harmless ভাবি। কিন্তু নবী ﷺ আমাদের জানাচ্ছেন, প্রশংসা মানুষের নফসকে ফুলিয়ে দিতে পারে, তাকে নিজের ব্যাপারে বিভ্রান্ত করতে পারে, এবং তার অন্তরকে মানুষের কথার ওপর নির্ভরশীল বানিয়ে ফেলতে পারে। তাই প্রশংসা পাওয়া যেমন পরীক্ষা, প্রশংসা ভালোবাসাও তেমন পরীক্ষা।

হুব্বুল মাদহের কিছু সূক্ষ্ম লক্ষণ আছে। যেমন, কোনো ভালো কাজ করার পর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে ইচ্ছে হয়, কে কী বলল; মানুষ প্রশংসা করলে কাজের আগ্রহ বাড়ে, কিন্তু নীরব থাকলে মন মরে যায়; নিজের নাম উল্লেখ না হলে কষ্ট লাগে; প্রশংসা শুনলে ভেতরে প্রশান্তি আসে, কিন্তু সংশোধন শুনলে অন্তর শক্ত হয়ে যায়; আরেকজন বেশি সম্মান পেলে বুকের মধ্যে চাপা প্রতিযোগিতা কাজ করে; এমনকি কখনো ভালো কাজটাও আমরা ধরে রাখতে পারি না, কারণ এর পেছনে আসলে আল্লাহর সন্তুষ্টির চেয়ে মানুষের স্বীকৃতির অংশ বেশি ছিল।

আজ social media এই রোগকে আরও জটিল করে দিয়েছে। আগে মানুষ হয়তো সামনে বসে প্রশংসা চাইত, এখন চায় likes, comments, reactions, shares, public mention, tag, appreciation post. এখন অনেক সময় নফস সরাসরি বলে না, “আমাকে প্রশংসা করো”; বরং বলে, “আমি তো শুধু মানুষকে motivate করতে চেয়েছি।” কিন্তু অন্তরের গভীরে যদি কষ্ট হয় যে মানুষ আমাকে appreciate করল না, তাহলে বুঝতে হবে, রোগটা এখনও বেঁচে আছে।

এখন প্রশ্ন হলো, প্রশংসা ভালো লাগা কি সবসময় গুনাহ? না, স্বাভাবিকভাবে কারও ভালো কথা শুনে ভালো লাগতেই পারে। সমস্যা তখন, যখন প্রশংসা প্রয়োজন হয়ে যায়, নেশা হয়ে যায়, চালিকা শক্তি হয়ে যায়। যখন বান্দা ভালো কাজের পর মানুষের মুখ চায়, আর নীরবতা সহ্য করতে পারে না, তখন তা অন্তরের রোগ।

তাহলে এর চিকিৎসা কী?

প্রথম চিকিৎসা হলো, নিজেকে জিজ্ঞেস করা: কেউ না জানলে, আমি কি একই কাজ করতাম? এই প্রশ্নটা খুব কঠিন, কিন্তু খুব দরকারি। কেউ না জানলে যদি আমার আগ্রহই না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, নিয়তে মানুষের অংশ ঢুকে গেছে।

দ্বিতীয় চিকিৎসা, গোপন আমল বাড়ানো। এমন কিছু নামাজ, দোয়া, সদকা, কান্না, কুরআন তিলাওয়াত, মানুষের উপকার, যা শুধু আপনি আর আল্লাহ জানেন। গোপন আমল ইখলাসের জন্য বড় ওষুধ। কারণ সেখানে applause-এর সুযোগ কম।

তৃতীয় চিকিৎসা, প্রশংসা শুনলে সঙ্গে সঙ্গে অন্তরকে আল্লাহর দিকে ফেরানো। কেউ যদি বলে, “আপনি খুব ভালো করেছেন”, তখন অন্তরে বলুন, “আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাওফিক দিয়েছেন।” কৃতিত্বকে নিজের কাছে জমা না রেখে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে দিন।

চতুর্থ চিকিৎসা, সমালোচনা সহ্য করার অভ্যাস। যে মানুষ শুধু praise নিতে পারে, correction নিতে পারে না, তার নফস এখনও প্রশিক্ষিত হয়নি। প্রশংসা আনন্দ দেয়, সমালোচনা আয়না দেখায়। দুটোই দরকার।

পঞ্চম চিকিৎসা, কবুলিয়াতকে applause-এর চেয়ে বড় ভাবা। মানুষ আজ প্রশংসা করবে, কাল ভুলে যাবে। কেউ আপনাকে “দ্বীনদার”, “সৎ”, “উপকারী” বললেই আপনি আল্লাহর কাছে তেমন হয়ে গেলেন না। আবার কেউ mention না করলেই আপনার আমল মূল্যহীন হয়ে গেল না। মানুষের নীরবতা আপনার কাজের মূল্য নির্ধারণ করে না; আল্লাহর কবুলিয়াতই আসল মূল্য।

ষষ্ঠ চিকিৎসা, প্রশংসা না পেলেও ভালো কাজ চালিয়ে যাওয়া। এটিই ইখলাসের বড় পরীক্ষা। যখন অন্তর বলবে, “কী লাভ? কেউ তো বোঝে না”, তখনও কাজ করে যাওয়াই মুজাহাদা। আজ একটু নিজের অন্তরে তাকাই: আমি কি মানুষের প্রশংসা না পেলে কষ্ট পাই? আমি কি কাজের পর আল্লাহর কবুলিয়াতের চেয়ে মানুষের প্রতিক্রিয়া বেশি দেখি? আমি কি নীরব খেদমতের চেয়ে visible খেদমত বেশি পছন্দ করি? আমি কি অন্যের প্রশংসা সহজে নিতে পারি, নাকি আমার নাম না থাকলে অস্বস্তি হয়? আমি কি ভালো কাজের reward মানুষের মুখে খুঁজি?

মনে রাখুন, মানুষের প্রশংসা অন্তরের জন্য মিষ্টি, কিন্তু সব মিষ্টি সুস্থতার জন্য ভালো নয়। অনেক সময় এই মিষ্টিই ইখলাসকে অসুস্থ করে দেয়। একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন হওয়া উচিত, মানুষ জানুক বা না জানুক, আল্লাহ জানেন। মানুষ বলুক বা না বলুক, আল্লাহ দেখছেন। মানুষ সম্মান দিক বা না দিক, আল্লাহ কবুল করুন, এটাই যথেষ্ট।

আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরকে প্রশংসার নেশা থেকে হেফাজত করুন, ইখলাস দান করুন, মানুষের স্বীকৃতির চেয়ে তাঁর সন্তুষ্টিকে বড় করে দেখার তাওফিক দিন, এবং আমাদের ভালো কাজগুলোকে নফসের খাদ্য নয়, আখিরাতের সঞ্চয় বানিয়ে দিন। আমিন।

অধ্যায় ০৭

শামাতাহ | অন্যের পতনে গোপন আনন্দ

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

> **সূত্র ও সম্পাদকীয় নোট**
>
> বর্ণনার মূল্যায়ন: তিরমিযি ২৫০৬ এর আরবি পাঠে ইমাম তিরমিযির হাসান গরিব মন্তব্য আছে; একই প্রকাশিত পাতায় Darussalam-এর মূল্যায়ন দাঈফ। মতভেদটি অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। এই বর্ণনা দিয়ে কোনো ব্যক্তির ওপর অবশ্যই একই বিপদ আসবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে না।
>
> তিরমিযি ২৫০৬

কেউ একসময় আপনাকে ছোট করেছিল। তারপর একদিন শুনলেন, সে নিজেই কোনো সমস্যায় পড়েছে। মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু অন্তরের খুব গভীর থেকে একটা কথা উঠে এলো, “ঠিকই হয়েছে।” কেউ আপনাকে কষ্ট দিয়েছিল। পরে তার নিজের জীবনেও কষ্ট এলো। মনে হলো, “এবার বুঝুক কেমন লাগে!”

যে মানুষটিকে আপনি পছন্দ করেন না, তার ব্যবসায় ক্ষতি হলো। তার সম্পর্ক ভেঙে গেল। তার কোনো ভুল সবার সামনে প্রকাশ হয়ে গেল। সে অপমানিত হলো। আপনি হয়তো প্রকাশ্যে হাসলেন না। কিন্তু তার কষ্টের খবরটি শুনে আপনার নিজের মনটা একটু ভালো হয়ে গেল। এই অনুভূতির নাম, শামাতাহ (الشماتة)।

সহজ ভাষায়, অন্যের বিপদ, অপমান, ব্যর্থতা বা পতনে গোপনে আনন্দ পাওয়া। এটি এমন এক অন্তরের রোগ, যা মুখে ধরা নাও পড়তে পারে। মানুষ হয়তো বলে, “আমি তো কিছু করিনি।” “আম শুধু ঘটনাটা শুনেছি।” “ও নিজের কর্মের ফল পেয়েছে।” “আমি হাসিনি তো!”

কিন্তু প্রশ্ন হলো, তার কষ্টে আমার অন্তর আনন্দ পেল কেন?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ

অর্থ: “তোমার ভাইয়ের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করো না; হতে পারে আল্লাহ তার প্রতি রহম করবেন এবং তোমাকে পরীক্ষায় ফেলবেন।”, জামে আত তিরমিযি, ২৫০৬; রিয়াদুস সালিহীন, ১৫৭৭। হাদিসটির শেষ অংশটা একটু থেমে পড়ুন। আল্লাহ তার প্রতি রহম করতে পারেন, আর আপনাকে পরীক্ষা করতে পারেন। আজ যার ভুল দেখে আমি হাসছি, কাল আমিই সেই ভুলে পড়ে যেতে পারি। আজ যার সংসার ভাঙা দেখে মনে মনে তৃপ্তি পাচ্ছি, কাল আমার জীবনেও পরীক্ষা আসতে পারে। আজ যার গুনাহ প্রকাশ হয়ে গেছে:

আমার কত গুনাহ আল্লাহ এখনো ঢেকে রেখেছেন?

আজ যে অপমানিত, আল্লাহ কাল তাকে সম্মানিত করতে পারেন। আর আজ যে নিরাপদ মনে করে হাসছে, সে আগামীকালের পরীক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানে না। কুরআন এমন এক মানসিকতার কথাও তুলে ধরে, যেখানে অন্যের ভালোতে কষ্ট হয় আর অন্যের বিপদে আনন্দ আসে। আল্লাহ বলেন, তোমাদের ভালো কিছু হলে তারা কষ্ট পায়, আর তোমাদের কোনো বিপদ হলে তারা তাতে আনন্দিত হয়। আয়াতটির মূল প্রসঙ্গ শত্রুভাবাপন্ন লোকদের আচরণ; কিন্তু এটি আমাদের সামনে এক ভয়ংকর অন্তরের চিত্রও তুলে ধরে, অন্যের ক্ষতি আমার আনন্দের কারণ হয়ে যাওয়া। একটু নিজের দিকে তাকাই।

কেউ ব্যর্থ হলে কি আমার নিজের অবস্থানকে বড় মনে হয়?

কেউ অপমানিত হলে কি মনে হয়, “দেখেছ, আমি ঠিকই বলেছিলাম”?

কেউ গুনাহে পড়ে গেলে কি তার জন্য ভয় ও দোয়ার বদলে ভেতরে superiority আসে?

যে আমাকে কষ্ট দিয়েছে, তার কষ্টে কি আমার নফস শান্তি খুঁজে?

এগুলো খুব uncomfortable প্রশ্ন। কিন্তু অন্তরের রোগের সিরিজে আমরা অন্যের diagnosis করছি না। নিজের অন্তরের আয়না দেখছি। “ও তো আমার সঙ্গে খারাপ করেছে”, তাহলে? এখানেই সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা। যে আমাদের কখনো কষ্ট দেয়নি, তার বিপদে সহানুভূতিশীল হওয়া সহজ।

কিন্তু যে আপনাকে অপমান করেছে?

যে আপনার বিরুদ্ধে কথা বলেছে?

যে আপনার হক নষ্ট করেছে?

তার বিপদে অন্তর কী করে, সেখানেই নফসের আসল অবস্থা ধরা পড়ে। ইসলাম জুলুমকে সমর্থন করতে বলে না। অন্যায় থামলে স্বস্তি পাওয়া আর মানুষটির ব্যক্তিগত যন্ত্রণায় আনন্দ পাওয়া এক জিনিস নয়। একজন জালিমের জুলুম বন্ধ হয়েছে, এতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য স্বস্তি হতে পারে।

কিন্তু তার অসুস্থতা, পারিবারিক বিপদ, সন্তানের কষ্ট, অপমান বা এমন কোনো দুর্ভোগে আনন্দ পাওয়া, যার সঙ্গে ন্যায় প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক নেই, এটা অন্য বিষয়। নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে:

আমি কি ন্যায়বিচার চাই?

নাকি:

আমি তাকে কষ্ট পেতে দেখতে চাই? দুটি অনুভূতি দেখতে কাছাকাছি হতে পারে। কিন্তু অন্তরে তাদের উৎস এক নয়।

শামাতাহর সবচেয়ে সূক্ষ্ম রূপগুলো এটা সবসময় উচ্চস্বরে হাসি নয়। অনেক সময়: কেউ ব্যর্থ হলে তার খবরটা বারবার পড়তে ভালো লাগে। কেউ ভুল করলে মনে হয়, “এবার সবাই ওর আসল চেহারা দেখুক।” কেউ অপমানিত হলে সেই ঘটনা অন্যদের বলতে অদ্ভুত আনন্দ হয়। কেউ সমস্যায় পড়লে বাইরে sympathy দেখাই, কিন্তু অন্তরে মনে হয়, “প্রাপ্য ছিল।” কেউ পড়ে গেলে তাকে উঠতে সাহায্য করার বদলে নিজের পুরোনো কষ্টের হিসাব মেলাতে শুরু করি। কেউ তাওবা করে বদলে গেলেও মনে হয়, “ওর অতীত আমি ভুলব না।” এভাবেই অন্যের দুর্বলতা আমাদের নফসের খাবার হয়ে যায়।

কুরআন মুমিনদের পরস্পরকে উপহাস করতে নিষেধ করেছে এবং মনে করিয়ে দিয়েছে, যাকে তুমি ছোট ভাবছ, সে আল্লাহর কাছে তোমার চেয়েও উত্তম হতে পারে। এটাই শামাতাহর বিরুদ্ধে বড় শিক্ষা। আজ যাকে দেখে আপনি বলছেন, “দেখেছ, শেষ পর্যন্ত কী হলো?” হয়তো তার এই বিপদই তার তাওবার কারণ হবে। হয়তো সে রাতে কাঁদবে। হয়তো আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন।

আর আপনি?

হয়তো তার পতন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে থাকতে নিজের অন্তরের অহংকারটাই দেখতে পেলেন না।

কেন অন্যের পতন ভালো লাগে?

অনেক সময় শামাতাহর পেছনে আরও কিছু পুরোনো রোগ থাকে। হিংসা: সে ভালো ছিল, তাই তার পতনে স্বস্তি। কিবর: তাকে নিচে দেখে নিজেকে বড় মনে হয়। প্রতিশোধের নেশা: সে কষ্ট দিয়েছিল, তাই তার কষ্টকে নিজের ন্যায়বিচার মনে হয়। প্রশংসার নেশা: প্রতিদ্বন্দ্বী কমলে নিজের গুরুত্ব বাড়বে। কুধারণা: আমরা আগে থেকেই তাকে খারাপ ধরে নিয়েছিলাম; তার বিপদকে নিজের ধারণার প্রমাণ বানাই।

দেখুন, অন্তরের রোগগুলো একা আসে না। একটি আরেকটিকে খাওয়ায়। তাই চিকিৎসাও শুধু মুখ বন্ধ রাখলে হবে না। অন্তরের আনন্দের উৎসটাই ধরতে হবে।

তাহলে চিকিৎসা কী?

১. সঙ্গে সঙ্গে নিজের নফসকে ধরুন

অন্যের বিপদে ভেতরে আনন্দ এলো?

নিজেকে বলুন: “এই অনুভূতিটা সুন্দর নয়।” অনুভূতি লুকিয়ে নিজেকে ধার্মিক প্রমাণ করার দরকার নেই। রোগ ধরা পড়া মানেই চিকিৎসা শুরু।

২. মনে করুন, আপনিও পরীক্ষার বাইরে নন

আজ সে। কাল আমি। এই পৃথিবীতে কারও জন্য স্থায়ী নিরাপত্তার certificate নেই। আল্লাহ চাইলে এক মুহূর্তে অবস্থা বদলে দিতে পারেন। এই চিন্তা প্রতিশোধের আনন্দকে ভয় আর বিনয়ে বদলে দেয়।

৩. যার বিপদে আনন্দ হয়েছে, তার জন্য দোয়া করুন

নফস বলবে, “না, ওর জন্য কেন দোয়া করব?”

ঠিক এই কারণেই করুন। বলুন, “হে আল্লাহ, তাকে সংশোধন করুন, তার কষ্ট সহজ করুন এবং আমার অন্তরকেও পবিত্র করুন।” দোয়া সবসময় আপনার অনুভূতিকে সঙ্গে সঙ্গে বদলে দেবে না। কিন্তু অন্তরকে প্রশিক্ষণ দেবে।

৪. বিপদকে entertainment বানাবেন না

কারও scandal, divorce, failure, exposed sin বা humiliation, এসব নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করা, screenshot পাঠানো, “দেখেছ কী হয়েছে?” বলে ছড়ানো, শামাতাহকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। একজন মানুষ পড়ে গেছে। আমার দায়িত্ব কি তাকে নিয়ে content বানানো? নাকি নিজের পরিণতির জন্য ভয় করা?

৫. নিজের ঢাকা গুনাহ মনে করুন

মানুষটির ভুল প্রকাশ পেয়েছে। আপনারটা পায়নি। এই পার্থক্যটি পবিত্রতা প্রমাণ করে না। হয়তো আল্লাহ শুধু আপনাকে আড়াল করে রেখেছেন। এই চিন্তা অন্যের অপমান দেখে হাসতে দেয় না। বরং বলতে শেখায়, “আল্লাহ, তারও পর্দা করুন, আমারও পর্দা করুন।”

৬. ক্ষমা মানে ভুলকে সঠিক বলা নয়

যে আপনাকে কষ্ট দিয়েছে, তার কাজ ভুল ছিল, এটা স্বীকার করেও তার ধ্বংস কামনা না করা সম্ভব। Boundary রাখা যায়। দূরে থাকা যায়। হক দাবি করা যায়। ন্যায়বিচার চাওয়া যায়। কিন্তু অন্তরকে প্রতিদিন তার দুর্ভোগের অপেক্ষায় বসিয়ে রাখলে, সে মানুষটি দূরে থেকেও

আপনার হৃদয়ের ভেতর জায়গা দখল করে রাখে। এটা মুক্তি নয়। এটা অন্য ধরনের বন্দিত্ব। আজ নিজেকে জিজ্ঞেস করি: যে আমাকে কষ্ট দিয়েছে, তার কষ্টে আমার অন্তর কী অনুভব করে? কেউ পড়ে গেলে আমি কি তাকে শিক্ষা হিসেবে দেখি, নাকি entertainment হিসেবে? কোন মানুষের ভুল প্রকাশ হলে আমি কি নিজের জন্য ভয় পাই, নাকি মনে মনে আনন্দ করি?

আমি কি ন্যায় চাই, নাকি প্রতিশোধের নামে কারও যন্ত্রণা দেখতে চাই?

মনে রাখুন, অন্যের পতনে আপনার উচ্চতা বাড়ে না। অন্যের অপমানে আপনার সম্মান বাড়ে না। অন্যের কষ্ট আপনার ক্ষত সারায় না। বরং কখনো কখনো অন্যের বিপদে গোপন আনন্দই প্রমাণ করে, ক্ষতটা এখনও সারেনি, নফসটা এখনও শান্ত হয়নি।

আল্লাহ আমাদের এমন অন্তর দিন, যা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়, কিন্তু মানুষের কষ্টে নিষ্ঠুর নয়। যে অন্তর ন্যায় চায়, প্রতিশোধের নেশা নয়। যে অন্তর অন্যের পতনে হাসে না; বরং নিজের শেষ পরিণতির জন্য ভয় করে। আল্লাহ আমাদের অন্তরকে শামাতাহ, হিংসা, অহংকার ও বিদ্বেষ থেকে পবিত্র করুন। আমিন।

অধ্যায় ০৮

হুব্বুদ দুনিয়া | দুনিয়ার মোহ

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

> **সূত্র ও সম্পাদকীয় নোট**
>
> সম্পাদকীয় সূত্র নোট: আল হাদীদ ৫৭:২০ ও আল কাসাস ২৮:৭৭ এর প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। অপরিচিত ব্যক্তি বা পথিকের উপমা সহিহ বুখারি ৬৪১৬ এ আছে।

একটা সুন্দর ঘর চাই। ভালো ব্যবসা চাই। টাকা চাই। আরাম চাই। সম্মান চাই। সফলতা চাই। সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ চাই। এগুলোর কোনোটাই নিজে থেকে হারাম নয়। ইসলাম আমাদের দুনিয়া ছেড়ে পাহাড়ে চলে যেতে বলেনি। হালাল রিজিক উপার্জন, পরিবারকে ভালো রাখা, সুন্দর জীবন গড়া, ব্যবসা করা, উন্নতি করা, এসবও নিয়ত ঠিক থাকলে ইবাদতের অংশ হতে পারে। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় তখন: যখন দুনিয়া হাতে না থেকে ধীরে ধীরে অন্তরে ঢুকে যায়। যখন টাকা হারানোর ভয় গুনাহের ভয়কে ছাড়িয়ে যায়। যখন ব্যবসা বাঁচাতে নামাজ পিছিয়ে যায়। যখন মানুষের চোখে সম্মান হারানোর ভয় আল্লাহর কাছে অপমানিত হওয়ার ভয় থেকেও বড় হয়ে ওঠে।

যখন একটি দুনিয়াবি সুযোগ হাতছাড়া হলে আমরা রাতভর কাঁদি, কিন্তু একটি ফরজ নষ্ট হলে অন্তর ততটা ব্যথিত হয় না। তখন বুঝতে হবে, সমস্যা শুধু ব্যস্ততার নয়। অন্তরের ভেতরে একটি রোগ জন্ম নিচ্ছে। এই রোগের নাম, হুব্বুদ দুনিয়া (حُبُّ الدُّنْيَا) দুনিয়ার মোহ সহজ ভাষায়: দুনিয়াকে এত বেশি ভালোবেসে ফেলা, এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া, এত বেশি আঁকড়ে ধরা, যে আখিরাত ধীরে ধীরে দ্বিতীয় স্থানে চলে যায়।

দুনিয়া থাকা সমস্যা নয় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুরুতেই পরিষ্কার করা দরকার। দুনিয়াকে ব্যবহার করা আর দুনিয়ার দাস হয়ে যাওয়া এক জিনিস নয়। আপনার অনেক টাকা থাকতে পারে, তবু আপনি দুনিয়াবিমুখ হতে পারেন।

আবার খুব অল্প টাকা থাকতে পারে, তবু সারাদিন দুনিয়ার চিন্তায় ডুবে থাকতে পারেন। দুনিয়ার মোহ ব্যাংক ব্যালেন্স দিয়ে মাপা হয় না। অন্তরের আসন দিয়ে মাপা হয়। আপনার ঘর আছে, সমস্যা নয়। প্রশ্ন হলো:

ঘরটা আপনার হাতে আছে, নাকি হৃদয়ের ভেতরে?

আপনার ব্যবসা আছে, সমস্যা নয়। প্রশ্ন হলো:

ব্যবসা কি আল্লাহর আদেশের নিচে, নাকি আল্লাহর আদেশকেই ব্যবসার নিচে নামিয়ে দিয়েছেন?

আপনার টাকা আছে, সমস্যা নয়। প্রশ্ন হলো:

টাকা আপনার খেদমত করছে, নাকি আপনি টাকার গোলাম হয়ে গেছেন?

আল্লাহ তাআলা বলেন, “জেনে রাখো, দুনিয়ার জীবন তো খেল তামাশা, সাজসজ্জা, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব এবং সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা মাত্র...”, সূরা আল হাদীদ, ৫৭:২০ এই আয়াত দুনিয়াকে একেবারে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে না। বরং দুনিয়ার আসল প্রকৃতি দেখাচ্ছে। শুরুতে খেলা। তারপর সাজসজ্জা। তারপর কে বড়, কে বেশি সফল, এই প্রতিযোগিতা। তারপর সম্পদ। তারপর সন্তান। তারপর একদিন, সব রেখে চলে যাওয়া। আজ যে জিনিস নিয়ে আমরা এত অস্থির, কয়েক বছর পর সেটি অন্য কারও হাতে থাকবে। আজ যে ঘর নিয়ে গর্ব করছি, একদিন সেখানে অন্য মানুষ থাকবে।

আজ যে নাম পরিচয় নিয়ে এত ব্যস্ত, একদিন মানুষ ভুলেও যাবে। কিন্তু যে আমল নিয়ে আমরা আল্লাহর কাছে যাব, সেটাই থাকবে। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, “বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাত উত্তম এবং স্থায়ী।”, সূরা আল আ'লা, ৮৭:১৬ থেকে ১৭ খেয়াল করুন, আয়াতে বলা হয়নি মানুষ দুনিয়াকে ভালোবাসে। বলা হয়েছে, দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়। এটাই আসল পরীক্ষা।

কোনটি আগে? নামাজ, নাকি কাজ?

হালাল, নাকি বেশি লাভ? আল্লাহর সন্তুষ্টি, নাকি মানুষের approval?

সত্য, নাকি নিজের position? আখিরাত, নাকি আজকের আরাম?

আমরা মুখে বলতে পারি, "আখিরাতই আসল।" কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন সিদ্ধান্তই বলে দেয়, আসলে কোন জীবনকে আমরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। দুনিয়ার মোহের সবচেয়ে ভয়ংকর দিক, এটি ধীরে ধীরে আসে কেউ এক সকালে উঠে বলে না, "আজ থেকে আমি দুনিয়ার দাস।" না। এটা খুব ধীরে আসে। প্রথমে, আরেকটু টাকা। তারপর, আরেকটু status। তারপর, আরেকটু comfort। তারপর, আরেকটু recognition।

তারপর একদিন দেখা যায়, আল্লাহর জন্য সময় নেই। কুরআনের জন্য সময় নেই। সিজদায় মন নেই। দোয়ার মধ্যে ব্যাকুলতা নেই। কিন্তু business notification এলে সঙ্গে সঙ্গে দেখি। Bank balance কমলে বুক ধড়ফড় করে। Follower কমলে কষ্ট হয়। মানুষ কী বলল, তা মনে থাকে। কিন্তু আজ কয় ওয়াক্ত সালাতে মন ছিল, সেটা মনে থাকে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কাঁধ ধরে বলেছিলেন, "দুনিয়ায় এমনভাবে থাকো যেন তুমি একজন অপরিচিত ব্যক্তি অথবা পথিক।", সহিহ বুখারি পথিক কী করে? সে সফরের পথে একটি সুন্দর জায়গা দেখলে উপভোগ করতে পারে। বিশ্রাম নেয়। খায়। প্রয়োজনীয় জিনিস ব্যবহার করে। কিন্তু সে সেখানে স্থায়ী বাড়ি বানিয়ে বসে না।

কারণ সে জানে, এটা গন্তব্য নয়। আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল হয় তখন, যখন সফরের বিশ্রামস্থলকেই গন্তব্য মনে করি। দুনিয়া আমাদের থামার জায়গা নয়। পেরিয়ে যাওয়ার জায়গা।

দুনিয়ার মোহের কিছু সূক্ষ্ম লক্ষণ

নিজেকে বিচার করার জন্য নয়।

নিজেকে চিনতে মিলিয়ে দেখুন, কাজের ব্যস্ততায় নামাজ পিছিয়ে দেওয়া কি স্বাভাবিক হয়ে গেছে? হালাল হারামের প্রশ্ন এলে কি লাভ ক্ষতির হিসাব আগে আসে? কোনো দুনিয়াবি ক্ষতিতে যতটা কষ্ট হয়, কোনো গুনাহে কি ততটা কষ্ট হয় না? মানুষের সামনে image রক্ষা করতে যত চেষ্টা করি, আল্লাহর কাছে অন্তর ঠিক রাখতে কি তত চেষ্টা করি? আমার mood কি টাকা, sales, likes, praise, promotion আর মানুষের আচরণের ওপর বেশি নির্ভরশীল?

দুনিয়ার কোনো জিনিস হারানোর ভয় কি মৃত্যুর পরের জবাবদিহির ভয়কে ছাড়িয়ে গেছে? আমি কি এমন জিনিসের জন্য দোয়া করি, যা শুধু দুনিয়া সুন্দর করবে, কিন্তু আখিরাতের জন্য খুব কম দোয়া করি? আমার দিনের সবচেয়ে fresh সময় কি দুনিয়ার জন্য, আর আল্লাহর জন্য বাকি ক্লান্ত সময়টুকু?

এই প্রশ্নগুলো কষ্টের। কিন্তু অন্তরের রোগের চিকিৎসা আরামদায়ক প্রশ্ন দিয়ে হয় না। "আমি তো শুধু পরিবারের ভবিষ্যৎ গড়ছি", এটাও কি দুনিয়ার মোহ? সবসময় নয়। পরিবারের জন্য উপার্জন করা দায়িত্ব। ভালো ভবিষ্যৎ গড়া ভালো। সঞ্চয় করাও জায়েয। উন্নতি করাও জায়েয।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোন মূল্যে? পরিবারের জন্য উপার্জন করতে গিয়ে পরিবারকে সময়ই দিচ্ছি না? টাকা বাড়াতে গিয়ে নামাজ নষ্ট করছি? সন্তানের দুনিয়াবি education নিয়ে এত চিন্তা করছি, কিন্তু তার ঈমান নিয়ে ততটা না? Halal income-এর বদলে শুধু higher income চাইছি? তখন "ভবিষ্যৎ গড়া" কথাটার আড়ালে কখনো কখনো দুনিয়ার মোহ লুকিয়ে থাকতে পারে। ইসলাম দুনিয়া ছেড়ে দিতে বলে না

আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দ্বারা আখিরাতের আবাস কামনা করো, আর দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না।", সূরা আল কাসাস, ২৮:৭৭ কী অসাধারণ ভারসাম্য! দুনিয়া থাকবে। কিন্তু দুনিয়া দিয়ে আখিরাত গড়তে হবে। টাকা থাকবে, কিন্তু হারাম কিনবে না। ব্যবসা থাকবে, কিন্তু নামাজ নেবে না। সম্মান থাকবে, কিন্তু কিবর জন্মাবে না। সন্তান থাকবে, কিন্তু আল্লাহকে ভুলিয়ে দেবে না। সফলতা থাকবে, কিন্তু মৃত্যু ভুলিয়ে দেবে না। দুনিয়া থাকবে হাতে। অন্তরে নয়।

তাহলে চিকিৎসা কী?

১. প্রতিদিন মৃত্যুকে স্মরণ করুন মৃত্যু নিয়ে depress হওয়ার জন্য নয়। Priority ঠিক করার জন্য।

নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, "আজ যদি আমার শেষ দিন হয়, আমি কি এই একইভাবে দিন কাটাতাম?" এই প্রশ্ন অনেক অপ্রয়োজনীয় দৌড় থামিয়ে দেয়।

২. যা হারালে আপনি ভেঙে পড়বেন, সেটা চিনুন

টাকা? ব্যবসা? মানুষের সম্মান? কোনো সম্পর্ক? Social status?

যে জিনিস হারানোর ভয় আপনাকে আল্লাহর চেয়েও বেশি কাঁপায়, সেখানেই হয়তো অন্তরের আসক্তি তৈরি হয়েছে।

৩. নিজের সম্পদকে আখিরাতের দিকে পাঠান

টাকা শুধু জমাবেন না। সামনে পাঠান। সদকা। মানুষের উপকার। ইলমের খেদমত। পরিবারে হালাল ব্যয়। কাউকে দাঁড়াতে সাহায্য করা। যে সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ হয়, সেটাই আসলে হারায় না।

৪. ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু comfort ছাড়ুন

সব চাওয়া পূরণ করতে হবে, এই নফসকে শেখাবেন না। কখনো না কিনুন। কখনো simple থাকুন। কখনো পুরোনো জিনিস ব্যবহার করুন। কখনো নিজের ইচ্ছাকে বলুন, "তুমি যা চাও, সব পাবে না।" এই ছোট ছোট মুজাহাদা দুনিয়ার মোহ দুর্বল করে।

৫. আখিরাতের জন্যও লক্ষ্য বানান

দুনিয়ার goal আছে, income goal। business goal। study goal। fitness goal। কিন্তু আখিরাতের? এই বছরে কতটা কুরআন বুঝব? কোন গুনাহ ছাড়ব? কোন গোপন আমল গড়ব? কোন মানুষের হক ফিরিয়ে দেব? কী রেখে মারা যেতে চাই? আখিরাত যদি priority হয়, তারও plan থাকা উচিত।

৬. প্রতিদিন নিজেকে মনে করান:

আমি মালিক নই। আমি অস্থায়ী আমানতদার। আমার টাকা, আমানত। আমার সন্তান, আমানত। আমার শরীর, আমানত। আমার business, আমানত। আমার সময়, আমানত। একদিন সবকিছুর হিসাব দিতে হবে। এই চিন্তা ownership-কে responsibility-তে বদলে দেয়।

নিজেকে জিজ্ঞেস করি, দুনিয়া কি আমার হাতে আছে, নাকি আমার অন্তরের ভেতরে? নামাজ আর লাভ একসঙ্গে না এলে আমি কোনটা বেছে নিই? মানুষের কাছে সফল দেখা আর আল্লাহর কাছে সফল হওয়া, কোনটা আমার কাছে বেশি জরুরি? আমি কি দুনিয়ার জন্য আখিরাত খরচ করছি, নাকি দুনিয়াকে আখিরাত গড়ার মাধ্যম বানাচ্ছি? মনে রাখুন: দুনিয়া থাকা বিপদ নয়। দুনিয়া

আপনাকে পেয়ে বসাই বিপদ। আপনার ঘর বড় হতে পারে। ব্যবসা বড় হতে পারে। সম্পদ বাড়তে পারে। কিন্তু অন্তর যেন আল্লাহর চেয়েও কোনো কিছুকে বড় না করে। কারণ একদিন, যে দুনিয়ার জন্য এত দৌড়েছি, সেই দুনিয়া পেছনে থেকে যাবে। আর আমরা একাই সামনে চলে যাব।

আল্লাহ আমাদের দুনিয়ার নিয়ামত দিন, কিন্তু দুনিয়ার দাস বানাবেন না। আমাদের হাতে রিজিক দিন, অন্তরে আখিরাত দিন। দুনিয়াকে আমাদের জন্য আখিরাতের পাথেয় বানিয়ে দিন, আখিরাত নষ্ট করার কারণ নয়। আমিন।

অধ্যায় ০৯

গাফলাহ | আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীনতা

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

> **সূত্র ও সম্পাদকীয় নোট**
>
> সম্পাদকীয় সূত্র নোট: আল কাহফ ১৮:২৮ এর প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। যিকিরকারী ও যিকির না করা ব্যক্তির জীবিত ও মৃতের উপমার সূত্র সহিহ বুখারি ৬৪০৭।

গাফলাহ খুব শব্দ করে আসে না। এটা মানুষকে একদিনে নষ্টও করে না। বরং ধীরে ধীরে এমনভাবে অন্তর দখল করে, মানুষ নিজেই বুঝতে পারে না, সে আগের মতো নেই। একসময় নামাজে দাঁড়ালে হৃদয় নরম হতো, কুরআন শুনলে ভেতরে কিছু নড়ে উঠত, গুনাহ হলে অন্তরে কষ্ট লাগত, দোয়ার সময় চোখ ভিজে উঠত। কিন্তু এখন? নামাজ হচ্ছে, কিন্তু মন অন্যখানে। কুরআন পড়া হয়, কিন্তু জীবন বদলাচ্ছে না। গুনাহ হচ্ছে, কিন্তু আগের মতো আর ভয় কাজ করছে না। সময় যাচ্ছে, দিন যাচ্ছে, বছর যাচ্ছে, অথচ অন্তর যেন ঘুমিয়ে আছে। এই অবস্থার নামই হলো গাফলাহ, আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ

“মানুষের হিসাব নিকাশের সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে, অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে আছে।” (সূরা আল আম্বিয়া, ২১:১) কী ভয়ঙ্কর কথা! হিসাব কাছে চলে আসছে, কিন্তু মানুষ ব্যস্ত অন্যদিকে। আখিরাত কাছে আসছে, কিন্তু চিন্তা দুনিয়াকে ঘিরে। মৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু প্রস্তুতি অনিশ্চিত। এটাই তো গাফলাহ, যখন মানুষ জানে, তবু ভাবে না; শোনে, তবু নেয় না; দেখে, তবু জাগে না। আরেক জায়গায় আল্লাহ বলেন,

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

“আপনি তার অনুসরণ করবেন না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কাজ সীমালঙ্ঘনে পরিণত হয়েছে।” (সূরা আল কাহফ, ১৮:২৮) এই আয়াতে গাফলাহর একটা গভীর চিত্র আছে। আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে গেলে মানুষ নিজের নফসের অনুসরণ শুরু করে। তার সিদ্ধান্ত, পছন্দ, সময়, সম্পর্ক, রাগ, আনন্দ, সবকিছু ধীরে ধীরে হিদায়াতের বদলে প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হতে থাকে। বাইরে সে হয়তো স্বাভাবিক, কিন্তু ভেতরে সে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার রবকে স্মরণ করে আর যে ব্যক্তি তার রবকে স্মরণ করে না, এ দুজনের উদাহরণ জীবিত ও মৃতের মতো।” (সহিহ বুখারী, ৬৪০৭) এই হাদীস শুধু যিকিরের ফযিলত বলছে না; এটা আমাদের অন্তরের অবস্থা বুঝাচ্ছে। যেখানে আল্লাহর স্মরণ নেই, সেখানে অন্তর ধীরে ধীরে প্রাণশূন্য হয়ে যায়। একজন মানুষ বাইরে খুব active হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর স্মরণহীন অন্তর আসলে ভেতর থেকে শুকিয়ে যেতে থাকে। গাফলাহর কিছু লক্ষণ আছে, যেগুলো আমরা নিজেদের ভেতরে খুঁজে দেখতে পারি।

প্রথমত, ইবাদত mechanical হয়ে যাওয়া। নামাজ পড়ি, কিন্তু তাড়াহুড়া করে। দোয়া করি, কিন্তু মন জুড়ে দুনিয়ার শব্দ। কুরআন পড়ি, কিন্তু তা সিদ্ধান্তে, আচরণে, দৃষ্টিতে, সময় ব্যবহারে কোনো প্রভাব ফেলে না।

দ্বিতীয়ত, গুনাহকে হালকা মনে হওয়া। আগে যেটা করলে অন্তরে ভয় লাগত, এখন সেটাই “এতো কিছু না” মনে হয়। এই অনুভূতিহীনতা খুব বিপজ্জনক। তৃতীয়ত, দুনিয়ার ব্যস্ততায় আখিরাত হারিয়ে যাওয়া। ফোন চেক করার সময় আছে, নোটিফিকেশন দেখার সময় আছে, মানুষের খবর রাখার সময় আছে, কিন্তু দু’মিনিট বসে নিজের অন্তরের খবর নেওয়ার সময় নেই। এমনও হয়, মানুষ খুব ক্লান্ত না, কিন্তু যিকিরে বসতে ইচ্ছা করে না। সমস্যা সময়ের অভাব না, সমস্যা অগ্রাধিকারের অভাব।

চতুর্থত, নসীহা শুনেও ভেতরে কম নড়া। মৃত্যুর কথা শুনি, কবরের কথা শুনি, হিসাবের কথা শুনি, কিন্তু অল্প সময় পর আবার সব আগের মতো। এই দ্রুত ভুলে যাওয়া গাফলাহরই একটি লক্ষণ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

“হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। আর যারা এমন করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।” (সূরা আল মুনাফিকূন, ৬৩:৯) খেয়াল করুন, ক্ষতি সবসময় হারাম কাজ থেকেই হয় না; কখনো কখনো হালাল ব্যস্ততাও মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়, যদি তা আল্লাহর স্মরণকে ঢেকে ফেলে। তাই গাফলাহ শুধু গুনাহে ডুবে থাকা নয়; গাফলাহ হলো এমনভাবে বেঁচে থাকা, যেখানে আল্লাহ কেন্দ্র থেকে সরে যান। এই রোগের চিকিৎসাও আছে, আলহামদুলিল্লাহ।

প্রথম চিকিৎসা, সচেতনভাবে নিজের অবস্থা স্বীকার করা। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন: আমি শেষ কবে অন্তর দিয়ে তাওবা করেছি? শেষ কবে নির্জনে আল্লাহকে ডেকেছি? শেষ কবে কুরআনের কোনো আয়াত আমার সিদ্ধান্ত পাল্টে দিয়েছে? শেষ কবে গুনাহ করে সত্যিকারের লজ্জা পেয়েছি?

দ্বিতীয় চিকিৎসা, যিকিরে ফিরে আসা। বেশি না, ছোট করে শুরু করুন। সকালে সন্ধ্যায় যিকির, হাঁটতে হাঁটতে ইস্তিগফার, কাজের ফাঁকে “সুবহানাল্লাহ”, “আলহামদুলিল্লাহ”, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”, অন্তরকে আবার জাগাতে শুরু করবে ইন শা আল্লাহ।

তৃতীয় চিকিৎসা, কুরআনের সাথে জীবন্ত সম্পর্ক গড়া। শুধু tilawat না; অর্থ বুঝে, থেমে থেমে, নিজের জীবনের সাথে মিলিয়ে পড়ুন। একটা আয়াতও যদি আজ আপনার হৃদয়ে নেমে যায়, সেটাই গাফলাহ ভাঙার শুরু হতে পারে।

চতুর্থ চিকিৎসা, নির্জনে কিছু সময় রাখা। সবাই থেকে না হোক, অন্তত noise থেকে। ফোন দূরে রেখে, এক কাপ পানি নিয়ে, দুই রাকাআত নামাজ পড়ে, কিছু সময় আল্লাহর সামনে বসুন। অনেক সময় অন্তরকে জাগাতে বড় আয়োজন লাগে না; লাগে সততা।

পঞ্চম চিকিৎসা, তাওবা ও মৃত্যু স্মরণ। যে অন্তর মৃত্যু ভুলে যায়, সে সহজেই গাফলাহয় পড়ে। আর যে অন্তর তাওবা করতে থাকে, সে ধীরে ধীরে নরম হতে থাকে। গাফলাহর সবচেয়ে বড় বিপদ হলো, মানুষ অসুস্থ, কিন্তু নিজেকে সুস্থ ভাবে। পথ হারিয়েছে, কিন্তু ভাবে ঠিক আছি। আল্লাহ থেকে দূরে সরে গেছে, কিন্তু ভাবে “একদিন ঠিক হয়ে যাবো।” কিন্তু সেই “একদিন” অনেকের জীবনেই আর আসে না।

তাই আজই একটু থামা দরকার। আজই একটু ভেবে দেখা দরকার, আমার অন্তর কি সত্যিই জাগ্রত? নাকি আমি শুধু বেঁচে আছি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি? আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরকে গাফলাহ থেকে হেফাজত করুন, তাঁর স্মরণে জীবন্ত রাখুন, কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক গভীর করুন এবং তাওবার দরজা আমাদের জন্য খুলে দিন। আমিন।

১. গাফলাহ শুরু হয় চুপচাপ, কিন্তু ক্ষতি করে গভীরে।

২. অন্তর জাগ্রত আছে, নাকি শুধু শরীর active, ভেবে দেখুন।

৩. আল্লাহর স্মরণহীন জীবন বাইরে পূর্ণ, ভেতরে শূন্য।

৪. এই পোস্টটি নিজের জন্য save করে রাখুন।

৫. আপনার কাছে গাফলাহর সবচেয়ে বড় লক্ষণ কী মনে হয়?

গাফলাহ কমানোর ৫টি ছোট আমল

১. ঘুম থেকে উঠে সবার আগে ফোন না, “আলহামদুলিল্লাহ” বলুন।

২. প্রতিদিন অন্তত ৫ মিনিট অর্থসহ কুরআন পড়ুন।

৩. দিনে ১০০ বার ইস্তিগফারকে habit করুন।

৪. প্রতিদিন অন্তত একবার মৃত্যুর কথা consciously স্মরণ করুন।

৫. দিনের শেষে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আজ কতবার আল্লাহকে মনে করেছি?

অধ্যায় ১০

কাসওয়াতুল ক্বলব | হৃদয়ের কঠোরতা

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

পড়ার আগে জরুরি নোট

সম্পাদকীয় সূত্র নোট: আল হাদীদ ৫৭:১৬, আয যুমার ৩৯:২২ ও আল বাকারা ২:৭৪ থেকে আয়াতের অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। বিনম্র না হওয়া অন্তর থেকে আশ্রয়ের দু'আর নির্দিষ্ট সূত্র সহিহ মুসলিম ২৭২২। চোখে পানি না আসা বা আবেগ কম অনুভব করাকে একা কারও ঈমানের চূড়ান্ত মাপকাঠি হিসেবে নেওয়া হচ্ছে না।

স্বাস্থ্য ও আধ্যাত্মিক আলোচনার সীমা: দীর্ঘস্থায়ী অনাগ্রহ, ক্লান্তি বা অনুভূতিহীনতার মতো উপসর্গ বিষণ্নতাতেও দেখা যেতে পারে। শুধু কান্না না আসা বা আগ্রহ কমা দেখে কাউকে গুনাহগার বা কঠিন অন্তরের মানুষ বলা যাবে না। উপসর্গ স্থায়ী হলে স্বাস্থ্যসেবাদাতার সহায়তা নিন। এই নোট রোগনির্ণয় নয়।

NIMH: Depression

সবচেয়ে ভয়ংকর বিপদ সবসময় গুনাহ নয়। অনেক সময় তার চেয়েও ভয়ংকর হলো, গুনাহের পরও অন্তর না কাঁপা। কুরআন শুনলেন, কিন্তু ভেতরে কিছু নড়ল না। মৃত্যুর খবর শুনলেন, কিন্তু জীবন বদলাল না। গুনাহ হলো, কিন্তু তাওবার তাড়না এলো না। নামাজ পড়লেন, কিন্তু অন্তর নরম হলো না। কারও কষ্ট দেখলেন, কিন্তু দয়া জাগল না। এটা শুধু ব্যস্ততা না। এটা শুধু mood off না। এটা শুধু "সময়ের সমস্যা"ও না। অনেক সময় এটা একটি গভীর অন্তরের রোগ, কাসওয়াতুল ক্বলব অর্থাৎ হৃদয়ের কঠোরতা।

এই সিরিজের আগের পর্বগুলোতে আমরা দেখেছি, রিয়া, উজব, কিবর, হাসাদ, কুধারণা, প্রশংসার নেশা, শামাতাহ, দুনিয়ার মোহ, গাফলাহ, এসব রোগ একা আসে না। এগুলো ধীরে ধীরে মানুষের অন্তরকে এমন জায়গায় নিয়ে যায়, যেখানে সত্য সামনে থাকলেও অন্তর সাড়া দিতে চায় না। আর সেখানেই জন্ম নেয় হৃদয়ের কঠোরতা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

“ঈমানদারদের জন্য কি এখনো সে সময় আসেনি, যখন আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে, তাতে তাদের অন্তর বিনম্র হবে?” সূরা আল হাদীদ, ৫৭:১৬ এই আয়াতে ঈমানদারদের অন্তর বিনম্র হওয়ার আহ্বান এসেছে। একজন মুমিনও নিজের অন্তরের অবস্থা যাচাই করবেন। তবে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির চোখে পানি না আসা দেখে তাঁর ঈমান বা অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দেওয়া ঠিক নয়। আরেক জায়গায় আল্লাহ বলেন:

فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ

“ধ্বংস তাদের জন্য, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে কঠোর হয়ে গেছে।” সূরা আয যুমার, ৩৯:২২ এটা খুবই ভয়াবহ সতর্কবার্তা। কারণ কঠিন অন্তর মানে শুধু চোখে জল না আসা নয়। কঠিন অন্তর মানে, সত্যকে শুনেও বদলাতে না চাওয়া, স্মরণ করিয়ে দিলেও গা না করা, গুনাহকে বারবার হালকা করে দেখা, আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েও হৃদয় নরম না হওয়া। আল্লাহ আরও বলেন:

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

“এরপর তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, পাথরের মতো, বরং তার চেয়েও কঠিন।” সূরা আল বাকারা, ২:৭৪ পাথরেরও তো একটা সীমা আছে। পাথর থেকেও পানি বের হয়, পাথর আল্লাহর ভয়ে গড়িয়ে পড়ে, আয়াতে সেই তুলনাও এসেছে। কিন্তু কিছু মানুষের অন্তর এমন হয়, যা উপদেশ, আয়াত, মৃত্যু, শিক্ষা, কিছুতেই নরম হয় না। এটাই অন্তরের রোগের ভয়ংকর পরিণতি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একজন বান্দা যখন একটি গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। যদি সে তাওবা করে, ক্ষমা চায়, ফিরে আসে, তাহলে তা মুছে যায়। আর যদি গুনাহ বাড়াতে থাকে, তাহলে সেই কালো দাগ পুরো অন্তরকে ঢেকে ফেলে। জামে তিরমিযী, ৩৩৩৪; ইবনু মাজাহ, ৪২৪৪ এটাই সেই "রান" বা মরিচা, যার কথা আল্লাহ তাআলা সূরা আল মুতাফফিফীনে বলেছেন:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরের ওপর মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।" সূরা আল মুতাফফিফীন, ৮৩:১৪ অর্থাৎ হৃদয় একদিনে পাথর হয় না। ধীরে ধীরে হয়। একটা গুনাহ। তারপর আরেকটা। তারপর তাওবা না করা। তারপর নসীহা শুনেও অবহেলা করা। তারপর দুনিয়াতে ডুবে থাকা। তারপর যিকির কমে যাওয়া। তারপর কুরআন থেকে দূরে সরে যাওয়া। তারপর হারামকে "small issue" ভাবা। তারপর একদিন দেখা যায়, অন্তর আছে, কিন্তু জীবন্ত নেই। হৃদয়ের কঠোরতার কিছু সূক্ষ্ম লক্ষণ আছে।

প্রথমত, ইবাদত ভারী লাগা। নামাজ পড়েন, কিন্তু যেন শুধু দায়িত্ব শেষ করছেন। যিকিরে স্বস্তি লাগে না। কুরআন খুলতে ইচ্ছে করে না। দ্বিতীয়ত, গুনাহের পর অন্তরে ব্যথা কমে যাওয়া। আগে যা করলে রাতে অস্থির লাগত, এখন তা "স্বাভাবিক" লাগে।

তৃতীয়ত, নসীহায় বিরক্তি। কেউ স্মরণ করিয়ে দিলে মনে হয়, "এত কথা বলার কী আছে?"

চতুর্থত, দয়া ও কোমলতা কমে যাওয়া। মানুষের কষ্ট দেখে অন্তর সহজে নড়ে না। পরিবার, সন্তান, গরিব, অসহায়, সবার ব্যাপারেই একটা emotional numbness তৈরি হয়। পঞ্চমত, আখিরাতের কথা শুনেও urgency না আসা। জান্নাত জাহান্নাম, হিসাব নিকাশ, কবর, সবই জানা, কিন্তু তা decision change করে না।

এখন প্রশ্ন হলো, এই রোগের চিকিৎসা কী?

প্রথম চিকিৎসা হলো, সৎভাবে স্বীকার করা যে আমার অন্তর অসুস্থ। যতক্ষণ মানুষ মনে করে, “আমি তো ঠিক আছি,” ততক্ষণ সে বদলাবে না। অন্তরের রোগের প্রথম দরজা, নিজের অবস্থা মানা। দ্বিতীয় চিকিৎসা, তাওবা। শুধু মুখে “আস্তাগফিরুল্লাহ” না; বরং নির্জনে বসে, নিজের গুনাহ মনে করে, লজ্জা নিয়ে, ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাওবা করা। কঠিন অন্তরের ওপর প্রথম আঘাতই হলো sincere tawbah।

তৃতীয় চিকিৎসা, কুরআনের সাথে ধীর, অর্থবোধক সম্পর্ক গড়া। শুধু তিলাওয়াতের গতি না; আয়াতের সামনে থামা, অর্থ পড়া, নিজেকে প্রশ্ন করা, “এই আয়াত আমার জীবনে কোথায় লাগছে?” কুরআন শুধু পড়ার জন্য না; অন্তর জাগানোর জন্য।

চতুর্থ চিকিৎসা, যিকির ও ইস্তিগফার বাড়ানো। অন্তর গাফলাহয় পড়ে, আর যিকির তাকে জাগায়। দিনে ছোট ছোট moments বানান, হাঁটতে হাঁটতে, কাজের মাঝে, শোয়ার আগে, ফজরের পরে, আল্লাহকে স্মরণ করুন। পঞ্চম চিকিৎসা, গুনাহের দরজা ছোট মনে করে খোলা রাখবেন না। অনেকেই বড় গুনাহ এড়িয়ে চলে, কিন্তু ছোট ছোট গুনাহ জমতে জমতেই অন্তর কালো হয়। চোখ, কান, জিহ্বা, scroll, comment, private habit, সবকিছুর হিসাব আছে।

ষষ্ঠ চিকিৎসা, মৃত্যু ও কবরকে মনে আনা। যে অন্তর সবসময় দুনিয়ার মধ্যে থাকে, তা শক্ত হয়। আর যে অন্তর মাঝে মাঝে নিজের শেষ ঠিকানার কথা ভাবে, তা কিছুটা নরম হয়। সপ্তম চিকিৎসা, সৎ মানুষের সঙ্গ। কিছু মানুষ আছে, তাদের পাশে থাকলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে। আবার কিছু সঙ্গ আছে, যা অন্তরকে আরও শুকিয়ে দেয়। আপনার অন্তর কোন পরিবেশে থাকে, সেটাও চিকিৎসার অংশ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করতেন, “আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা... মিন কালবিল লা ইয়াখশা” “হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এমন অন্তর থেকে, যা বিনম্র হয় না...”, সহিহ মুসলিম ভাবুন, নবী ﷺ-ই যদি এমন অন্তর থেকে আশ্রয় চান, তাহলে আমাদের কত বেশি ভয় করা উচিত! আজ একটু থামি। নিজেকে জিজ্ঞেস করি: আমি কি এখনো আয়াত শুনে কাঁপি? গুনাহ করলে আমার ভেতরে ব্যথা লাগে? দোয়া করতে বসলে আল্লাহর দরকার সত্যিই অনুভব করি? নাকি আমি শুধু আমল করছি, অথচ অন্তর ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে?

মনে রাখবেন, কঠিন অন্তর মানে আপনি শেষ হয়ে গেছেন, এটা না। বরং এর মানে হলো, এখনই ফিরে আসা দরকার। যতক্ষণ আপনি ভয় পাচ্ছেন, ততক্ষণ আশাও আছে। যতক্ষণ আপনার মনে হচ্ছে “আমার অন্তর কি কঠিন হয়ে যাচ্ছে?”, ততক্ষণ দরজা এখনো বন্ধ হয়নি। আল্লাহ চাইলে পাথরের মতো শক্ত অন্তরও নরম করতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরকে কুরআনের সামনে বিনম্র করে দিন, যিকিরে জীবন্ত করে দিন, গুনাহে লজ্জাশীল করে দিন, এবং কঠোরতা, গাফলাহ ও মরিচা থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

১. গুনাহের সবচেয়ে ভয়ংকর ফল, অন্তর আর কাঁপে না।

২. কুরআন শুনেও বদল না এলে, অন্তরকে পরীক্ষা করুন।

৩. হৃদয়ের কঠোরতা একদিনে আসে না।

৪. ছোট গুনাহও অন্তরকে অসাড় করে দিতে পারে।

৫. আজই একটু ভেবে দেখুন, আমার অন্তর এখন কেমন?

অন্তর নরম করার ৫টি আমল

১. প্রতিদিন অন্তত ১০ মিনিট অর্থসহ কুরআন পড়ুন।

২. নির্জনে তাওবা করুন, শুধু routine astaghfirullah না।

৩. ছোট গুনাহকেও হালকা ভাববেন না।

৪. দিনে ১০০ বার ইস্তিগফার habit করুন।

৫. প্রতিরাতে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আজ আমার অন্তর কতবার আল্লাহকে স্মরণ করেছে?

অধ্যায় ১১

সমাপনী | আমার অন্তর কি সত্যিই সুস্থ?

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের “হার্ট ডিজিজ | অন্তরের রোগ” সিরিজের ১০টি পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। এই সিরিজে আমরা কথা বলেছি এমন কিছু রোগ নিয়ে, যেগুলো শরীরে দেখা যায় না, কোনো পরীক্ষার রিপোর্টেও ধরা পড়ে না; কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের ইখলাস, আমল, চরিত্র এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ককে দুর্বল করে দেয়।

আমরা রিয়া, আত্মমুগ্ধতা, অহংকার, হিংসা, কুধারণা, প্রশংসার নেশা, অন্যের পতনে গোপন আনন্দ, দুনিয়ার মোহ, গাফলাহ এবং হৃদয়ের কঠোরতা নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু সিরিজ শেষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি এখনো বাকি:

এই পোস্টগুলো পড়ার সময় আমরা কি নিজের অন্তরকে দেখেছি, নাকি শুধু অন্য মানুষের কথা ভেবেছি?

রিয়া নিয়ে পড়ার সময় হয়তো মনে হয়েছে, “অমুক মানুষটা এমন।” অহংকারের পোস্ট পড়ে মনে হয়েছে, “এটা তো তমুকের পড়া দরকার।” কুধারণা নিয়ে আলোচনা দেখে এমন কারও কথা মনে হয়েছে, যে আপনাকে ভুল বোঝে। হিংসার পোস্ট কারও কাছে পাঠাতে ইচ্ছে হয়েছে। হৃদয়ের কঠোরতার পোস্ট পড়ে মনে হয়েছে, “আজকাল মানুষের অন্তর সত্যিই অনেক শক্ত হয়ে গেছে।”

কিন্তু নিজের নামটা কি কোথাও মনে এসেছে?

অন্তরের রোগের একটি বড় সমস্যা হলো, এগুলো আমরা অন্যের মধ্যে খুব সহজে দেখতে পাই, কিন্তু নিজের মধ্যে স্বীকার করতে কষ্ট হয়। কারণ চোখ অন্য মানুষের বাহ্যিক অবস্থা দেখে, কিন্তু নিজের অন্তর দেখতে হলে সততা, বিনয় এবং আত্মসমালোচনার প্রয়োজন হয়। আজ তাই কাউকে বিচার করার দিন নয়। আজ কোনো ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করারও দিন নয়। আজ শুধু নিজের সামনে বসার দিন। একটু শান্ত হয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন: মানুষ না দেখলে কি আমার ভালো কাজের আগ্রহ কমে যায়? কেউ প্রশংসা করলে কি আমল আরও সুন্দর হয়, আর কেউ না জানলে কি উৎসাহ হারিয়ে ফেলি? তাহলে আমার আমলে রিয়ার কোনো অংশ ঢুকে যাচ্ছে কি না, সেটা ভেবে দেখা দরকার।

নিজের নামাজ, পর্দা, জ্ঞান, ত্যাগ বা দ্বীনদারিতা নিয়ে কি কখনো নিজের ভেতরে গোপন মুগ্ধতা অনুভব করি? অন্যের ভুল দেখলে কি নিজের ভালোত্ব মনে পড়ে? তাহলে উজব বা আত্মমুগ্ধতার রোগ আমার অন্তরেও থাকতে পারে।

আমার চেয়ে কম শিক্ষিত, কম ধনী, কম পরিচিত কিংবা দ্বীন সম্পর্কে কম জানা মানুষকে কি ভেতরে ভেতরে ছোট মনে করি? কেউ আমাকে সংশোধন করলে কি প্রথমে সত্য যাচাই না করে মনে হয়, "সে আমাকে শেখাতে এসেছে?" তাহলে অহংকার হয়তো শুধু আচরণে নয়, অন্তরেও জায়গা করে নিয়েছে।

কেউ ভালো রিজিক, সুন্দর সংসার, ইলম, জনপ্রিয়তা বা মানুষের ভালোবাসা পেলে আমি কি সত্যিই তার জন্য খুশি হতে পারি? নাকি অন্তরে খুব সূক্ষ্মভাবে প্রশ্ন জাগে, "ও কেন পেল, আমি কেন পেলাম না?" তাহলে হিংসাকে শুধু অন্য মানুষের রোগ ভাবলে হবে না।

কেউ message-এর উত্তর দিতে দেরি করলে, সালাম না দিলে, কোনো অনুষ্ঠানে না ডাকলে কিংবা আমার পোস্টে react না করলে কি আমি সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাপারে খারাপ গল্প বানিয়ে ফেলি? প্রমাণ ছাড়াই মানুষের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা কুধারণার লক্ষণ হতে পারে।

ভালো কাজ করার পর কি মানুষের প্রশংসা, comment, appreciation বা স্বীকৃতির অপেক্ষা করি? কেউ আমার অবদানের কথা উল্লেখ না করলে কি মনে হয়, কাজটার কোনো মূল্যই রইল না? তাহলে হয়তো আল্লাহর কবুলিয়াতের চেয়ে মানুষের বাহবা আমার অন্তরে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

যে আমাকে কষ্ট দিয়েছে, তার নিজের জীবনে কষ্ট এলে কি অন্তরে গোপন স্বস্তি আসে? কারও ব্যর্থতা, অপমান বা পতনের খবর শুনে কি মনে হয়, "ঠিকই হয়েছে"? তাহলে নিজের অন্তরকে প্রশ্ন করতে হবে, আমি কি সত্যিই ন্যায়বিচার চাই, নাকি মানুষের কষ্ট দেখতে চাই?

দুনিয়া কি শুধু আমার হাতে আছে, নাকি ধীরে ধীরে অন্তরের ভেতরেও জায়গা করে নিয়েছে? Business loss, টাকা কমে যাওয়া, মানুষের সম্মান হারানো কিংবা কোনো দুনিয়াবি সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার ভয় কি গুনাহ ও আখিরাতের ভয়কে ছাড়িয়ে গেছে? তাহলে দুনিয়ার মোহকে হালকা করে দেখার সুযোগ নেই।

আমার দিন কি অনেক কাজ, message, scrolling, planning আর চিন্তার মধ্য দিয়ে শেষ হয়, অথচ আল্লাহকে খুব কম মনে পড়ে? নামাজ আছে, কিন্তু মন নেই; কুরআন আছে, কিন্তু জীবনে প্রভাব নেই; গুনাহ আছে, কিন্তু তাওবার তাড়না নেই, তাহলে গাফলাহ বা উদাসীনতা হয়তো ধীরে ধীরে অন্তর দখল করছে। আর সবচেয়ে ভয়ংকর প্রশ্ন: কুরআনের আয়াত শুনেও কি

অন্তর নরম হয় না? মৃত্যুর সংবাদ শুনে কয়েক মিনিট পরই কি জীবন আগের মতো হয়ে যায়? গুনাহের পরও কি অনুশোচনা কমে গেছে? নসিহাহ শুনলে কি বিরক্ত লাগে? মানুষের কষ্ট দেখেও কি দয়া জাগে না? তাহলে অন্তর কঠিন হয়ে যাচ্ছে কি না, সেটা খুব গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

“নিশ্চয়ই সফল হয়েছে সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর ব্যর্থ হয়েছে সেই ব্যক্তি, যে তাকে কলুষিত করেছে।”, সূরা আশ শামস, আয়াত ৯ থেকে ১০ এই সিরিজের উদ্দেশ্য কাউকে খারাপ মানুষ প্রমাণ করা নয়। প্রতিটি অনুভূতি নিয়ে ভয় ও হতাশার মধ্যে পড়ে যাওয়াও উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো, নিজের অন্তরের দিকে তাকানো, রোগের লক্ষণগুলো চিনে নেওয়া এবং আল্লাহর সাহায্যে চিকিৎসার পথে হাঁটা।

শরীরের রোগ লুকিয়ে রাখলে যেমন তা আরও বাড়তে পারে, অন্তরের রোগও তেমনই। কিন্তু রোগ চিনতে পারা মানেই আপনি শেষ হয়ে গেছেন, এটা নয়। বরং এর অর্থ হলো, আল্লাহ আপনাকে নিজের অবস্থা বুঝে ফিরে আসার সুযোগ দিয়েছেন।

এই ১০টি রোগের মধ্যে হয়তো একটিতে নিজের ছায়া দেখতে পেয়েছেন। হয়তো কয়েকটিতে। হয়তো প্রায় সবগুলোর মধ্যেই নিজের কিছু দুর্বলতা খুঁজে পেয়েছেন। লজ্জা পেয়ে দূরে সরে যাবেন না। তাওবা করুন। নিজেকে সংশোধন করুন। আল্লাহর কাছে সাহায্য চান।

যেখানে রিয়া আছে, সেখানে গোপন আমল বাড়ান। যেখানে অহংকার আছে, সেখানে সত্য গ্রহণের অনুশীলন করুন। যেখানে হিংসা আছে, সেখানে অন্যের জন্য বরকতের দোয়া করুন। যেখানে কুধারণা আছে, সেখানে প্রমাণ ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া বন্ধ করুন। যেখানে প্রশংসার নেশা আছে, সেখানে মানুষের বাহবার বদলে আল্লাহর কবুলিয়াত খুঁজুন। যেখানে দুনিয়ার মোহ আছে, সেখানে আখিরাতকে আবার অগ্রাধিকার দিন। যেখানে গাফলাহ আছে, সেখানে যিকির ও কুরআনের দিকে ফিরে আসুন। আর যেখানে হৃদয়ের কঠোরতা আছে, সেখানে আন্তরিক তাওবা নিয়ে আল্লাহর সামনে কাঁদুন।

অন্তর অসুস্থ হওয়া ভয়ংকর। কিন্তু এর চেয়েও ভয়ংকর হলো, অন্তর অসুস্থ, অথচ মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে করে। আল্লাহ আমাদের অন্যের রোগ খোঁজার আগে নিজের অন্তরের রোগ দেখার তাওফিক দিন। মানুষ আমাদের যেভাবে দেখে, তার চেয়েও আমাদের ভেতরকে সুন্দর করে দিন। আমাদের রিয়া থেকে ইখলাসে, অহংকার থেকে বিনয়ে, হিংসা থেকে প্রশস্ততায়, গাফলাহ থেকে তাঁর স্মরণে এবং কঠিন অন্তর থেকে জীবন্ত অন্তরে ফিরিয়ে আনুন। আমিন। আজ নিজের জন্য সত্যি করে উত্তর দিন:

এই ১০টি অন্তরের রোগের মধ্যে কোনটিতে আপনি নিজের দুর্বলতা সবচেয়ে বেশি দেখতে পেয়েছেন?

কাউকে বিস্তারিত জানাতে হবে না। শুধু নিজের কাছে সত্যবাদী হোন এবং আল্লাহর কাছে ফিরে আসুন।

মূল সূত্র ও পর্যালোচনার সীমা

যেখানে “বিষয় মিলেছে” লেখা আছে, সেখানে উল্লেখিত বর্ণনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বক্তব্য তুলনা করা হয়েছে। এটি প্রতিটি বাক্যের অনুবাদ, সব ফিকহি সিদ্ধান্ত, সনদ বা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের চূড়ান্ত অনুমোদন নয়। কুরআনের লিংকগুলো মূল লেখার উদ্ধৃতির নির্দেশিকা; এই ব্যাচে প্রতিটি আরবি হরকত ও অনুবাদের শব্দভিত্তিক নতুন যাচাই করা হয়নি।

১. রিয়া | লোক দেখানো

সহিহ মুসলিম ২৬৪২a: অনিচ্ছাকৃত প্রশংসা

নিয়তের আলোচনায় ভারসাম্যের সমান্তরাল সূত্র

আল আদাবুল মুফরাদ ৭১৬; গ্রেডিং: আলবানী, সহিহ

নির্দিষ্ট আরবি পাঠ ও প্রকাশিত গ্রেডিং মিলিয়ে পাঠসংশোধন

সূরা আল মাউন ১০৭:৪ থেকে ৬

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

ছোট শিরক: মুসনাদ আহমাদ ২৩৬৩০; হাসান, HadeethEnc

প্রকাশিত পাঠ ও গ্রেডিং মিলেছে

২. উজব | নিজের ভালোত্বে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাওয়া

সূরা আন নাজম ৫৩:৩২, প্রাসঙ্গিক অংশ

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সহিহ বুখারি ৫৬৭৩: আমল ও আল্লাহর রহমত

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

৩. কিবর | অহংকার

সহিহ মুসলিম ৯১a: অহংকারের অর্থ

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

সূরা লুকমান ৩১:১৮

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

৪. অন্যের ভালো দেখে বুক জ্বলে? সাবধান, এটা হিংসা হতে পারে

সূরা আন নিসা ৪:৫৪, প্রাসঙ্গিক অংশ

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সূরা আল ফালাক ১১৩:৫

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সহিহ মুসলিম ২৫৬৪a: হিংসা ও পারস্পরিক অধিকার

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

সহিহ বুখারি ১৩: ভাইয়ের কল্যাণ কামনা

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

সহিহ মুসলিম ৪৫: সমান্তরাল সূত্র

মূল লেখায় উল্লেখিত; বিস্তারিত যাচাই বাকি

৫. কুধারণা | প্রমাণ ছাড়াই মানুষের ব্যাপারে খারাপ ভাবা

সূরা আল হুজুরাত ৪৯:১২, প্রাসঙ্গিক অংশ

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সহিহ বুখারি ৬০৬৪: কুধারণা

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

৬. হুব্বুল মাদহ | প্রশংসার নেশা

সহিহ মুসলিম ২৬৪২a

প্রশংসা পাওয়াকে সরাসরি রিয়া না বলার প্রসঙ্গ

সূরা আন নাজম ৫৩:৩২, প্রাসঙ্গিক অংশ

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সহিহ বুখারি ২৬৬২: অতিরিক্ত প্রশংসা

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

৭. শামাতাহ | অন্যের পতনে গোপন আনন্দ

জামি‘ আত তিরমিযি ২৫০৬: গ্রেডিংয়ে মতভেদ

তিরমিযি: হাসান গরিব; Darussalam: দাঈফ

রিয়াদুস সালিহীন ১৫৭৭: মূল লেখার সমান্তরাল উদ্ধৃতি

মূল লেখায় উল্লেখিত; বিস্তারিত যাচাই বাকি

৮. হুব্বুদ দুনিয়া | দুনিয়ার মোহ

সূরা আল হাদীদ ৫৭:২০, প্রাসঙ্গিক অংশ

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সূরা আল আ‘লা ৮৭:১৬ ও ১৭

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সূরা আল কাসাস ২৮:৭৭, প্রাসঙ্গিক অংশ

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সহিহ বুখারি ৬৪১৬: অপরিচিত ব্যক্তি বা পথিক

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

৯. গাফলাহ | আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীনতা

সূরা আল আম্বিয়া ২১:১

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সূরা আল কাহফ ১৮:২৮, প্রাসঙ্গিক অংশ

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সূরা আল মুনাফিকূন ৬৩:৯

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সহিহ বুখারি ৬৪০৭: যিকিরকারীর উপমা

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

১০. কাসওয়াতুল ক্বলব | হৃদয়ের কঠোরতা

NIMH: Depression

স্বাস্থ্যসীমা স্পষ্ট করার সম্পাদকীয় উৎস

সূরা আল হাদীদ ৫৭:১৬, আয়াতের অংশ

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সূরা আয যুমার ৩৯:২২, আয়াতের অংশ

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সূরা আল বাকারা ২:৭৪, আয়াতের অংশ

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সূরা আল মুতাফফিফীন ৮৩:১৪

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

জামি‘ আত তিরমিযি ৩৩৩৪: অন্তরের কালো দাগ

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

সুনান ইবন মাজাহ ৪২৪৪: সমান্তরাল বর্ণনা

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

সহিহ মুসলিম ২৭২২: বিনম্র না হওয়া অন্তর থেকে আশ্রয়

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

১১. সমাপনী | আমার অন্তর কি সত্যিই সুস্থ?

সূরা আশ শামস ৯১:৯ ও ১০

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

নতুন তথ্যের উৎস ও সম্পাদনার সীমা এই তালিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। কোনো স্বাধীন পর্যালোচকের অনুমোদন বা স্বাক্ষর দেওয়া হয়নি। বইটি এখনও অপ্রকাশিত Review Edition।